মোটকু মামার গোয়েন্দা অভিযান

আনিসুল হক

মোটকু মামা এতই মোটা যে রিকশাওয়ালারা তাকে রিকশায় তুলতে চান না, আর যদিও বা তিনি রিকশায় ওঠেন, রিকশার চাকা যায় ফেটে। বাসে যখন তিনি বসেন, তাঁর হাঁটু যায় সামনের সিটের সঙ্গে আটকে। এই মোটকু মামা, আর তার ক্লাস সিক্সে পড়া ভাগ্নে অয়ন, অয়নের বন্ধু টুটুল, আর টুটুলের রিনিখালা মিলে বেরুলেন একটা গোয়েন্দা অভিযানে। অয়নের ছোটখালার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে, সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই তাদের মিশন। কিন্তু পথে পথে ঘটল কতই না বিপত্তি। শেষে কুকুরের তাড়া খেয়ে মোটকু মামা আটকে গেলেন এক ভাঙা দেয়ালের ফোকরে। সেখান থেকে কিছুতেই তাকে বের করা যাচ্ছে না। টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে এই দৃশ্য। কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় দেয়াল ভাঙাও যাচ্ছে না। কী হবে মোটকু মামার? আর এক ভয়ঙ্কর চোরাকারবারি দলকে ওরা ধরলই বা কী করে?

প্রচ্ছদ • ধ্রুব এষ

মোটকু মামার গোয়েন্দা অভিযান

আনিসুল হক

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী পিএমজেএফ
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল : ০১৫৫২৩৯১৩৪১, ০১৭১১ ৪০০২১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১১২৩৯১
E-mail : info@mizanpublishers.com
www.mizanpublishers.com

প্রথম প্রকাশ ❑ একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৯
সপ্তম প্রকাশ ❑ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১০

স্বত্ব
পদ্য পারমিতা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার (চতুর্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১২৩৯৫

মূল্য
১০০ টাকা মাত্র

ISBN
984-70050-0048-9

Motku Mamar Goenda Avijan Written by Anisul Hoque
Published by Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary PMJF
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2rd Floor), Dhaka-1100
Printed by : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka-1100

উৎসর্গ

পদ্য এবং তার বন্ধুদের

ভূমিকা

পদ্য বার বার বলল, বাবা, এইসব কী লেখো? মোটাদের তুমি আঘাত দিচ্ছ কেন? সিরিয়াস বিষয় নিয়ে লেখো, যাতে আমিও পড়তে পারি। পদ্যকে বলি, দেখো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ছুটি* গল্প শুরু করলেন বালকদের কৌতুক দিয়ে। দুষ্টুমি দিয়ে। তাই বলে *ছুটি* কি সিরিয়াস গল্প নয়?

আসলে হাসির গল্প লিখতেই যে আমার ভালো লাগে। হাসির মধ্য দিয়ে শুরু করি, তারপর সেটা যদি গুরুতর হয়ে পড়ে, তাহলে তো আমার আর কিছু করার থাকে না।

আমার এই গোয়েন্দা গল্পটাও হাসি-তামাসা দিয়ে শুরু, শেষটা? থাক, সেটা আর বলছি না। তোমরা নিজেরা পড়ে নাও।

আনিসুল হক
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

১

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত্রি হয়। মোটকু মামাকে কোনো রিকশাওয়ালাই তার রিকশায় সহজে নিতে চান না। রিকশাওয়ালাদের দোষ দিয়ে লাভ কী? তিনটা মাঝারি সাইজের লোকের চেয়ে মোটকু মামার ওজন বেশি বই কম নয়। আর মামা রিকশায় বসলে তার শরীরটা রিকশার সিটে আঁটেও না। দুই পাশ দিয়ে তার শরীরের মেদবহুল বাড়তি অংশ, যেমন পেটের দুপাশ, ঝুলে থাকে। ভুঁড়িটাও রিকশাওয়ালার পিঠ স্পর্শ করে ফেলে প্রায়।

এই রকম একটা বিশাল বপুর অধিকারী যে মানুষ, তাকে কোন্ রিকশাওয়ালা তার রিকশায় স্বেচ্ছায় সানন্দে নেবেন?

অবশ্য মোটকু মামার কাছে পাল্টা যুক্তি আছে। তিনি বলেন, রিকশাভ্যানচালকরা এক ভ্যানে ছয়জন এমনকি দশজনকেও বহন করে। আমার ওজন কি দশজনের ওজনের চেয়েও বেশি?

তা হয় তো নয়। আসলে মোটকু মামার ওজন কত, সেটা আমরা কেউ জানি না। মামা কোনোদিনও ওজন মাপা যন্ত্রে ওঠেননি। তিনি বলেন, আমাকে পরিমাপ করতে পারবে, এমন যন্ত্র আজও এই ধুলার ধরায় আবিষ্কৃত হয়নি। কথাটার মধ্যে সত্যতা থাকতেও পারে। আমরা কেউ কোনোদিন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করিনি।

আজকে বোধ হয় আমাদের কপাল ভালো ছিল। রাস্তায় বেরুনো মাত্র একজন রিকশাওয়ালা মোটকু মামাকে নিতে রাজি হয়ে গেল।

মামা তাঁর বিস্ময় গোপন রাখতে পারলেন না। বললেন, 'কী ব্যাপার, আপনি রাজি হয়ে যাচ্ছেন যে। প্যাসেঞ্জার কিন্তু আমি। আপনি চালাবেন। আর আমি আপনার রিকশায় উঠব।'

রিকশাওয়ালা তার পেশি ফুলিয়ে বলল, 'আপনে কেন, আপনার মতো দশটারে এক লগে এক রিকশায় তুইলা আমি টানতে পারুম। আমারে ডর দেখাইয়েন না।'

মামা বললেন, 'ভাই আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন। প্রার্থনা করি, বাংলার ঘরে ঘরে আপনার মতো সদয় আর সমর্থ রিকশাওয়ালা জন্ম নিক।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'আমারে কিন্তু ভাড়া ডাব্‌ল দিতে হইব।'

মামা বললেন, 'আলবৎ। অবশ্যই আপনাকে আমি ভাড়া ডাব্‌ল দেব। আর আপনার কথা শুনে খুশি হয়েছি বলে কিছু বখশিসও আপনি পাবেন। চলুন।'

মামার রিকশা পাওয়া নিয়েই বেশি ঝামেলা হয়। তার আজকের এই বিশেষ গোয়েন্দা অভিযাত্রী দলে আরও আছি আমরা তিনজন। আমার নাম অয়ন। আমি পড়ি ক্লাস সিক্সে। সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুলে। আমাদের এই গোয়েন্দা মামার আমি বিশেষ রকমের সহচর। মামা বিশ্বাস করেন, মামা-ভাগ্নে যেখানে, আপদ নাই সেখানে। কাজেই যে-কোনো গোয়েন্দা অপারেশনে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে সঙ্গে নেন। আমার সঙ্গে আজ চলেছে আমাদের পাশের ফ্লাটের টুটুল। সেও ক্লাস সিক্সে পড়ে। তবে আমাদের স্কুলে নয়। ও পড়ে ধানমণ্ডি বয়েজ স্কুলে। টুটুলরা এই বাসায় মাস ছয়েক হলো এসেছে। আমরা সমবয়সী, বিকেল হলে নিচে গিয়ে সাইকেল চালাই, সিঁড়িতেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এইভাবে প্রথমে পরিচয়, তারপর গভীর বন্ধুত্ব। মোটকু মামা একজন শখের গোয়েন্দা, এটা জেনে সে আমাকে বলে রেখেছে, এরপরে যখন গোয়েন্দা অভিযান হবে, আমি যেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। টুটুল যখন আজকে আমাদের সঙ্গে বেরুচ্ছে, তখন তার রিনিখালাও আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন। টুটুলের মা বলে দিয়েছেন, তিনি একা একা টুটুলকে কোথাও ছাড়েন না। ঢাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা শহর। রিনি অবশ্যই টুটুলের সঙ্গে যাবে।

আমি একটু বিপদেই পড়েছিলাম। মোটকু মামা এই ধরনের একটা বিপজ্জনক অভিযানে সঙ্গে করে একজন তরুণীকে নেবেন কিনা। রিনিখালা আমার মনোভাব আন্দাজ করে বলে দিয়েছেন, তিনি কারও সঙ্গে

যাবেন না, তিনি যাবেন নিজের দুটো পায়ের ওপরে ভর করে। তিনি দরকার হলে দূর থেকে টুটুলের ওপর নজর রাখবেন। কাজেই তাকে নিয়ে যেন কেউ চিন্তা না করে। এই দেশে প্রতিটা মানুষেরই স্বাধীনভাবে চলাচলের স্বাধীনতা আছে। নারীদের আরো বেশি আছে। রিনিখালা যাচ্ছেন স্বাধীনভাবে।

কাজেই আমরা চারজন চলেছি। মোটকু মামা, টুটুল, রিনিখালা আর আমি– অয়ন। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে আমরা নেমে এলাম নিচে, রাস্তায়। প্রথমেই মোটকু মামা রিকশা পেয়ে গেলেন। এরপর আমরা তিনজন। আমরা তিনজনই হাল্কা-পাতলা। টুটুল আর আমি তো হাল্কা আর পাতলা বটেই, রিনিখালাও স্লিম ফিগারের স্মার্ট তরুণী। একটা রিকশায় আমরা তিনজন পাশাপাশি খুব আরামে বসতে পারব।

মামা রিকশায় উঠে বসেছেন। রিকশা চলতে শুরু করেছে। আমরা আরেকটা রিকশার খোঁজে মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করেছি। মামার রিকশা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। আমরা তার সঙ্গে তাল রেখে জোরে জোরে হাঁটছি। এই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। মনে হচ্ছে একটা বোমা ফাটল এবং শব্দটা মামার রিকশা থেকেই আসছে। অপরাধীরা কি জেনে গেছে আমাদের মোটকু মামা তার বিশেষ গোয়েন্দা অভিযান শুরু করে দিয়েছেন? অঙ্কুরেই তারা তাদের শত্রুকে বিনাশ করতে চায়! তাই তারা অভিযান শুরুর মুহূর্তেই হামলা করে বসল মামাকে?

রিনিখালা খিলখিল করে হাসছেন। তার হাসিতে পুরো গলি সচকিত। এই রকম বিপদের মুহূর্তে কেউ হাসে! ভদ্রমহিলার মাথা ঠিক আছে তো?

আশে-পাশের সবাই হাসছে। ব্যাপার কী?

ব্যাপার আর কিছু না। মোটকু মামাকে বহনকারী রিকশার চাকা ফেটে গেছে। শুধু টায়ার ফেটে গেছে তাই না, রিকশার একটা চাকা বেঁকে গেছে। মামা কাত হয়ে ধপাস করে পিচঢালা পথে পড়ে গেছেন। মামা চিৎকার করে বলছেন, 'ওরে তোরা আয়। আমাকে তোল। ধরণী ব্যথা পাচ্ছে।'

আমরা দৌড় ধরলাম। মামাকে তুলতে হবে। রাস্তা ব্যথা পাচ্ছে। রিকশাওয়ালা তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। দশজন

মোটকু মামাকে একাই বহন করার দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আমি আর টুটুল মামার পিঠ ধরে ধাক্কা মারতে লাগলাম। রিকশাওয়ালা মামার দুইহাত ধরে টানছেন। উফ্। এই ভদ্রলোককে তোলার চেয়ে মনে হয় একটা তিমি মাছ টেনে তোলা সহজ।

রিনিখালা হাসছেন তো হাসছেনই। হাসির দমকে তার চোখ থেকে চশমাটা যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে। কী ধরনের নিষ্ঠুর একজন মানুষ সঙ্গে করে যে আজকে আমরা অভিযানে বের হলাম! আজ আমাদের কপালে কী দুঃখ-কষ্টটাই না জানি আছে!

আমার ভীষণ রাগ হতে লাগল রিনিখালার ওপরে।

রিনিখালা হাসি থামালেন। তারপর বললেন, 'সুজন ভাইয়া, উঠুন। নিন আমার হাত ধরুন।' মামা বললেন, 'উঠতে পারছি না তো।'

'তাহলে কিন্তু আমি আপনাকে কাতুকুতু দেব।' রিনিখালা আরো জোরে হেসে উঠে বললেন।

'অয়নরে। উনি এসব কী বলছেন রে?' মামা অসহায় কণ্ঠে বললেন।

রিনিখালা সত্যি সত্যি মামার শরীরের কাছে তার হাতের আঙুলগুলো নিয়ে গিয়ে তিরতির করে কাঁপাতে লাগলেন। আর অমনি মামা একহাত মাটিতে ঠেস দিয়ে আরেক হাতে রিকশাওয়ালার হাত ধরে ঝট করে উঠে পড়লেন।

তখন রিনিখালা তার দিকে তেড়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে কাতুকুতু দেবার অভিনয় করলেন। আর তাতেই মামা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি দেখে রিনিখালা সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কী হাসিটাই না হাসতে লাগলেন। উফ, এই মহিলার কি হাসিরোগ আছে!

মামা বললেন, 'ইয়ে মিস রিনি, আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিযানে বের হয়েছি। আমাদেরকে বিষয়টা খুবই সিরিয়াসলি নিতে হবে।'

রিনিখালা বললেন, 'আমি বিষয়টা খুবই সিরিয়াসলি নিয়েছি।' তিনি তার হাসি চেপে রাখার ব্যর্থ কসরত করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো তার হাসি বেরিয়ে এলো।

মামা বললেন, 'অয়ন।'

আমি বললাম, 'জিব মামা।'

'আমরা আজকে কেন বের হয়েছি?'

'একটা ভেরি ইম্পর্টান্ট রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে?'

'রহস্যটা কী?'

'ছোটখালার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে। সকালবেলা ছোটখালা ফোন করে কান্নাকাটি করছেন। ড্রাইভার কাউকে না বলে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেছে। সে কোথায় গেছে কেউ জানে না। আর তাঁর ড্রাইভার ফোনও ধরছে না। আজকাল প্রায়ই গাড়ি চুরি হচ্ছে। ছোটখালা আমাকেও এই কথা বলেছেন। তার ধারণা গাড়িটা এতক্ষণে ধোলাইখালে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। আর ড্রাইভার হয় গাড়িচোর সিন্ডিকেটের সদস্য, নয়তো তাকে মেরে গুম করে ফেলা হয়েছে।'

'হুঁ। ছোটআপা আমাদেরকে এই গাড়ি উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য ডেকেছেন। আমরা যাচ্ছি। টুটুলও আমাদের সাথে যাচ্ছে। টুটুল তোমাকে আমরা কেন নিয়েছি?' মামা বললেন।

টুটুল বলল, 'কারণ মামা এটাই তো আপনাদের সাথে আমার কথা ছিল। আমিও গোয়েন্দা গল্প খুব ভালোবাসি। তাই আপনি যখন গোয়েন্দা অভিযানে বের হবেন, আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন।'

মামা বললেন, 'তাহলে এই মিস রিনি আমাদের সঙ্গে কেন?'

'কারণ', টুটুল বলল, 'মা আমাকে একা ছাড়বেন না। তাই রিনিখালা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।'

মামা বললেন, 'কিন্তু আমরা তাকে সঙ্গে নেব নাকি নেব না, এটা এখনই ফয়সালা করতে হবে। এই রকম একটা সিরিয়াস কাজে বের হয়ে কেউ এই রকম হালকাভাবে হাসতে পারে?'

রিনিখালা বললেন, 'আচ্ছা আমি আর হাসব না। আমি তো আমাদের গোয়েন্দা মিশন নিয়ে হাসছি না। কেউ যদি রিকশা থেকে এইভাবে পড়ে যায়, আর উঠতে না পারে, তাহলে তাকে কাতুকুতু থেরাপি দিয়ে যদি তোলা যায়, তখন কি আর না হেসে পারা যায়?' বলে তিনি আবার ফিক করে হেসে ফেললেন।

মামা বললেন, 'যা হবার হয়েছে। আর হাসা যাবে না। এবার আমরা একটা ট্যাক্সি নেব।'

২

আমরা ট্যাক্সি নিলাম। কলাবাগান মোড়েই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। একটা হলুদ ট্যাক্সি। মোটকু মামার জন্যে চালকের পাশের আসনটি পিছিয়ে দেওয়া হলো। মামা অতি কষ্টে সেই সিটে বসলেন। আমরা তিনজন পেছনে বসলাম। ট্যাক্সি চলছে। ট্যাক্সি চালক বললেন, 'শুনছেন, ইঞ্জিনে কেমন শব্দ করতাছে। সিএনজি দিয়া মনে হয় এত লোড চালান যাইব না। তেল দিয়া চালাই। ভাইজান, ভাড়াটা বাড়ায়া দিয়েন।'

মামা রাগী স্বরে বললেন, 'আচ্ছা ভাড়া বাড়িয়ে দেব। আপনি এখন চলুন তো কল্যাণপুর।'

ট্যাক্সি চলছে। জানালা খোলা। জানালা দিয়ে সকালবেলার বাতাস আসছে। বসন্তের বিখ্যাত বাতাস। এই বাতাসকে বলে দক্ষিণা সমীরণ। আমার বেশ আরাম লাগছে।

আমাদের স্কুল ছুটি হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার জন্য। টুটুলের স্কুল আর আমাদের স্কুল দুটোই বাংলা মিডিয়াম স্কুল। আমাদের স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার সিট বসে। তখন অন্য ক্লাসগুলো ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই ছুটিতে আমরা করার মতো কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আজকে একটা গোয়েন্দা অভিযানে বেরুতে পেরে আমরা দুজনেই উত্তেজিত। ট্যাক্সিতে বসে ঢাকার রাজপথ দেখছি। রাস্তা ভরা কত প্রকারের যানবাহন। রাস্তার ধারে বড় বড় বিলবোর্ড। কোথাও ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি দাঁড়ালেই ভিক্ষুকরা এসে হাত পাতছে। ফেরিওয়ালারা নানা ধরনের জিনিস ফেরি করছে। একটা বাচ্চা ছেলে পপকর্ন বিক্রি করছে। সে পপকর্নকে বলছে পাপ্পন।

কল্যাণপুরে ছোটখালার ফ্লাট। ১৪ তলা ভবনের ১১ তলায় ছোটখালা থাকেন। ট্যাক্সি আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে গেল খালার ফ্লাটবাড়ির সামনে।

এখন ১১ তলায় উঠতে হবে। লিফ্‌ট আছে। কিন্তু মামা তো লিফ্‌টে উঠবেন না। লিফ্‌টে না ওঠার পেছনে ইতিহাস আছে। একবার তিনি একটা উঁচুভবনের লিফ্‌টে উঠেছিলেন। সেই লিফ্‌টটা ছিল মাত্র চারজনের জন্যে। মামা ওঠার পর লিফ্‌ট কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হয়ে যায়। আর দরজা খুলছিল না। মামা প্রথমে অ্যালার্ম বাজান। তখনও লিফটের ভেতরে আলো ছিল। এক সময় অ্যালার্মও বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকারে একটা মোবাইল ফোনের আলোয় তিনি নিজের সাহস ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তবে তিনি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না। কারণ লিফ্‌টের ভেতরে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। মেকানিক এসে লিফ্‌টের দরজা খোলে। মামার অচেতন দেহটা লিফট থেকে বের করতে তাদের বহুত কসরত করতে হয়েছিল।

মামা সেই গল্প আমাদের অনেকবার শুনিয়েছেন। এরপরে তিনি কান ধরে প্রতিজ্ঞা করেন, আর কোনোদিনও তিনি লিফটে উঠবেন না। তিনি সব সময় সিঁড়ি ব্যবহার করেন। মামার ভারে কোনো সিঁড়ি ভেঙে গেছে, এ ধরনের কোনো খবর আমাদের জানা নেই।

মামা বললেন, 'তোরা লিফটে করে ওপরে ওঠ। ছোটআপাকে নিচে নামিয়ে আন। আমি ততক্ষণে নিচের জায়গাটা একটু সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখি।'

আমি বললাম, 'সেই ভালো মামা। তুমি যদি ১১ তলা ওঠো, আর নামো, তাহলে তুমি হয়তো ঠিকই থাকবে, কিন্তু তোমার গা থেকে যে পরিমাণে ঘাম বের হবে, তাতে জগৎটায় গঙ্গা বয়ে যাবে। আর যে হাঁপানোটা তুমি হাঁপাবে, তাতে জায়গাটায় বাতাসের গতিবেগ বেড়ে গিয়ে...'

মামা বললেন, 'অয়ন। অতিরিক্ত কথা এবং কাজ বিপদ ডাকিয়া আনে।'

আমরা তিনজন, রিনিখালা, টুটুল আর আমি, লিফ্‌টে করে আমার ছোটখালার ফ্লাটের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম।

বেল দিতেই ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, 'অয়ন ভেতরে আয়, দরজা খোলা আছে।' ছোটখালার গলা।

টুটুল ফিসফিসিয়ে বলল, 'কী করে বুঝল, তুমি এসেছ!'

আমি বললাম, 'মনে হয় মামা মোবাইলে ফোন করে বলেছেন। আর না হলে গেট থেকে দারোয়ান ইন্টারকম ফোনে বলে দিয়েছে।'

আমরা ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

রিনিখালা আর টুটুলকে বসালাম বৈঠকখানায়। খালা এলেন শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে।

বললেন, 'আমার এত শখের গাড়ি। টয়োটা এলিয়ন। একেবারে অরিজিনাল ব্লাক কালার। গাড়িতে শখ করে একটা সিডি প্লেয়ার কেবল লাগিয়ে নিয়েছিলাম। এইভাবে সেটা চুরি হয়ে গেল।' তার কণ্ঠে রোদন, চোখে অশ্রু।

আমি বললাম, 'খালা, মোটকুমামা যখন তোমার এই চুরি রহস্য উদ্ঘাটন করতে রাজি হয়েছেন, তুমি আর চিন্তা কোরো না। ধরো এটা এসেই গেছে। এখন চলো, আমাদের সাথে নিচে চলো। মামা নিচে অপেক্ষা করছেন।'

খালা বললেন, 'চল। এই দুঃসময়ে বাসায় আমি একা। তোর খালু গেছেন অস্ট্রেলিয়া।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমার মনে হয়, আমার কতগুলো প্রশ্নের উত্তর জোগাড় করার চেষ্টা করা উচিত। যেমন ধরো, গাড়ির নম্বর কত, কী রং, ড্রাইভারের নামধাম পরিচয় ঠিকানা, ফোন নম্বর, এইসব তো মামা জানতে চাইবেন। তুমি এগুলো নিয়ে তারপর নিচে চলো।'

রিনিখালা বললেন, 'বাহবা। অয়ন, তোমার তো অনেক বুদ্ধি।'

আমি বললাম, 'মোটকু মামার সঙ্গে থেকে থেকে আমিও একজন ছোটখাট গোয়েন্দা হয়ে গেছি কিনা। আর মামার চেয়ে গোয়েন্দা সিরিজ আমিও কম পড়িনি। আমার তো বলতে গেলে ফেলুদা সিরিজের সব বই পড়া হয়ে গেছে।'

টুটুল বলল, 'আমিও ফেলুদা সব পড়ে ফেলেছি।'

ছোটখালা এরই মধ্যে ড্রাইভারের ঠিকানা লেখা একটা নোটবই আনলেন। 'তোর খালু তো দেশে নাই, অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন অফিসের কাজে, আমি তো তাকে ফোন করে জেনে নিয়েছি ড্রাইভারের ঠিকানা কোথায় লেখা। কত কষ্ট করে সেই নোটবই বের করলাম। আর টিয়ার গায়ে হলুদের সময় মজিদ তো একটা কুলা ধরেছিল। সেই কুলা ধরা একটা ফটোও পেলাম মজিদের।' মজিদ বোঝা যাচ্ছে ছোটখালার ড্রাইভারের নাম।

ছোটখালা তার অ্যালবাম থেকে তার ননদ টিয়ার গায়ে হলুদের একটা ফটো বের করে দিলেন। এই যে এটা হলো মজিদ...

রিনিখালা বললেন, 'হায় হায় এই ড্রাইভারের চেহারা তো সত্যি সত্যি চোর চোর। আপা, আপনি একে এতদিন ড্রাইভার রাখলেন কেন?'

ছোটখালা বললেন, 'আর বোলো না। সব সাগরের বাবার জন্য। আমি এতো বলি, ড্রাইভারের ভাব চোরের মতো, উনি কিছুই বলেন না। আপনি কে? আপনি কোত্থেকে এলেন?'

আমি হেসে বললাম, 'ছোটখালা, তুমি এতক্ষণ খেয়ালই করোনি ঘরে আরও দুজন মানুষ বসে আছে।'

ছোটখালা বললেন, 'খেয়াল করেছি, কিন্তু গাড়ি হারিয়ে মাথা ঠিক নাই, ওরা কে কেন এসেছে, জিগ্যেস করতে খেয়ালই হয়নি।'

আমি ওদের সঙ্গে ছোটখালার পরিচয় করিয়ে দিলাম।

তারপর আমরা নিচে নামলাম।

আমি, টুটুল, রিনিখালা আর ছোটখালা।

নিচে নেমে দেখি, মামা তখন এই বিল্ডিঙের দারোয়ানদের সঙ্গে কথা বলছেন। তারা বলল, অন্যদিনের চেয়ে মজিদ আজকে একটু তাড়াতাড়ি এসেছে। তারপর গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন সে আসার পর গেট থেকে বাসায় ফোন করে জানায় তার আসার খবর। কিন্তু আজকে তা করেনি। তারপর গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেছে। পরিচিত পুরোনো ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বের হলে সেটা নিয়ে দারোয়ানরা কোনো প্রশ্ন করে না। আজকেও করেনি।

ছোটখালা বললেন, 'আমি ভাবলাম একটু মোহাম্মদপুর মার্কেটে যাব। সকাল সকাল গেলে মাছটা পাওয়া যায় ভালো। ড্রাইভার এসেছে কিনা

খোঁজ নিই। ওমা এযে দেখছি কেঁচো খুঁড়তে কেউটে সাপ। ড্রাইভার নাকি সেই সকাল ৭টার মধ্যে এসে গেছে, গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। আশ্চর্য তো। গাড়ির চাবি রোজ তো সে যাওয়ার আগে দিয়ে যায়, কাল চাবিও দেয়নি। মানে আগে থেকেই সব প্লান প্রোগ্রাম করে রেখেছিল। সকাল সকাল এসে গাড়ি নিয়ে সটকে পড়েছে।'

মটকু মামা বললেন, 'গাড়ি নিয়ে সে কোন দিকে গেছে? কেউ কি দেখেছে?'

উপস্থিত ড্রাইভার, চালক আর বিল্ডিঙের কর্মচারীদের ডাকা হলো। তোমরা কি কেউ দেখেছ বা জানো, মজিদ গাড়ি নিয়ে কোথায় গেছে?

একজন বলল, গাড়ি নিয়ে মজিদকে সে পুরোনো ঢাকার দিকে যেতে দেখেছে।

'সর্বনাশ,' মামা বললেন, 'তার মানে তো সোজা ধোলাইখাল। ওদের একটা গাড়ির সমস্ত পার্টস খুলে নাটবল্টু বানিয়ে ফেলতে এক ঘন্টার বেশি লাগে না। বডির রংও ওরা পাল্টে ফেলে।'

ছোটখালা ধপাস করে মাটিতে বসে পড়লেন। আমার এতদামি গাড়িটা!

মোটকু মামা বললেন, 'ছোটআপা, তুমি ওঠো। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেব। কিন্তু তুমি যদি মাটিতে বসে থাকো, আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভব না। এই বডি নিয়ে আমি উপুড় হতে পারব না। আমার ভুঁড়ি হাঁটুতে ঠেকে যায়।'

ছোটখালা কান্নাভেজা গলায় বললেন, 'আমার মাথায় তোকে হাত বোলাতে হবে না। ভাই, আমার আদরের ছোটভাই, আমার গাড়িটা তুই উদ্ধার করে দে। তোকে খুব ভালো একটা বউ এনে দেব।'

মোটকু মামা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগলেন, 'না না না, এসব এখন বোলো না তো...এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য, তোমার গাড়িটা উদ্ধার করা।'

'কর। সেইটাই তো বলছি'– ছোটখালা বললেন।

টুটুল বলল, 'তাহলে মামা আমরা কী করছি?'

আমি বলি, 'আমার তো খিদে পেয়েছে। আমরা সকালে খাই নাই। ছোটখালার এখানে আমরা খেয়ে নিই।'

ছোটখালা বললেন, 'দেখ, রহিমার মা কী নাশতা বানিয়েছে। আমি কিছু জানি না।'

মামা বললেন, 'না না। এইসব কাজের মধ্যে তোরা কেন যে খাওয়ার কথা পাড়িস। আগে কাজ। আমাদের কাছে এখন ড্রাইভার মজিদের ফটো আর ঠিকানা আছে। আমরা আগে মজিদের বাড়ি যাব। ওর বাড়িতে কে কে আছে, এটা বের করব। আমার নিজের ধারণা বাড়িতে সে বউ-বাচ্চা রেখে দেবে না। ওদেরকেও সরিয়ে ফেলবে। সেটা যদি হয় আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে পুলিশে খবর দেওয়া। পুলিশের আইজি আছেন আমার বন্ধুর চাচা। তাকে ফোন করে পুলিশকে এলার্ট করা হবে। সব জায়গায় চেকপোস্ট বসানো হবে। আর ধোলাইখালে বিশেষ ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা হবে। তাহলে আজকের মধ্যেই গাড়ি বের হয়ে পড়বে।'

টুটুল বলল, 'তাহলে আমরা এখন ড্রাইভার মজিদের বাসায় যাচ্ছি। ওনার বাড়ি কীভাবে যাওয়া যাবে।

একজন ড্রাইভারের হাতে আমরা ঠিকানাটা দিলাম। তিনি বললেন, 'এই ঠিকানা তো দেখা যাইতাছে বুড়িগঙ্গার ওই পারে। আপনাগো নৌকা কইরা নদী পারাইতে হইব।'

'জীবনের চলার পথে অনেক নদীই আমাদের পাড়ি দিতে হবে'– টুটুল বলল।

টুটুলের মাথাটা বেশবড়, আর সে চশমা পরেছে মোটা ফ্রেমের। তাকে দেখাচ্ছে একজন বয়স্ক অধ্যাপকের মতো। আর সে কথাও বলে সব সময় দার্শনিকের মতো করে। আমরা আমাদের সঙ্গে একজন পিচ্চি সক্রেটিস নিয়ে যাচ্ছি।

রিনিখালা হাতে তালি দিয়ে উঠলেন, 'নৌকায় চড়ব। কতদিন নৌকায় চড়ি না।'

টুটুল বলল, 'রিনিখালা, আমরা একটা সিরিয়াস অপারেশনে যাচ্ছি, পিকনিকে যাচ্ছি না।'

টুটুলের প্যান্টটা আবার দুটো কাপড়ের বেল্ট দিয়ে দুই কাঁধের সঙ্গে বাঁধা। পুরোটাই তার গাম্ভীর্যের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে যা হোক।

আমরা বুড়িগঙ্গার ওইপারে ড্রাইভার মজিদের বাড়িতে যাবার জন্যে রওনা দিলাম। ছোটখালা বললেন, 'তোরা যাবি কী করে? ইস আমার গাড়িটা যদি থাকত, তাহলে তো তোরা গাড়ি করেই যেতে পারতি।'

রিনিখালা আবার হেসে উঠলেন, 'আপা, আমরা আপনার গাড়ির খোঁজেই তো যাচ্ছি।'

মোটকু মামা বললেন, 'আপা, একটা কাজ করো। কিছু টাকা-পয়সা দাও। আমরা এই ডিটেকটিভ ইনভেস্টিগেশনের জন্যে তোমার কাছে কোনো ফি নেব না। কিন্তু আমাদের যাতায়াত খরচ তো তোমাকে দিতেই হবে। তাই না?'

ছোটখালা মোটকু মামার হাতে কিছু পাঁচশ টাকার নোট ধরিয়ে দিলেন। সব কড়কড়ে চকচকে নোট।

তা দেখে মোটকু মামার চোখদুটো চকচক করে উঠল।

৩

আমরা পথে বের হলাম। কিন্তু এবার আর ট্যাক্সি পাওয়া সহজ হলো না। এই ঢাকা শহরে ট্যাক্সি-পাওয়া যে কী ঝামেলা! উপায়ান্তর না দেখে আমরা হাঁটতে লাগলাম। যদি সামনের মোড়ে একটা ট্যাক্সি জুটে যায়।

আমরা হাঁটছি। মামা বললেন, 'এই, শোন। এই জায়গাতে একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। এদের রান্নাটা খুব ভালো। বিশেষ করে কবুতরের রোস্টটা জোশ।'

রিনিখালা বললেন, 'তাহলে আমি ওই রেস্টুরেন্টের আশেপাশেই যাচ্ছি না!'

আমরা তিনজন একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'কেন?'

রিনিখালা বললেন, 'কবুতর হলো শান্তির প্রতীক। কবুতরের রোস্ট যে-রেস্টুরেন্টে খেতে দেওয়া হয়, আমি তার ত্রিসীমানাতেই নেই।'

মামা বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে তার পাশে আরেকটা রেস্টুরেন্ট আছে, যেখানে খুব ভালো তেহারি পাওয়া যায়।'

তেহারির কথা শুনে আমার জিভে জল চলে এলো।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ শুনেছি এদের তেহারিটা নাকি আসলেই খুব ভালো। চলো মামা...রিনিখালা চলেন যাই...টুটুল। বল না রিনিখালাকে...'

টুটুল বলল, 'না, রিনিখালাকে আমি কিছু বলতে পারব না। কারণ আপ রুচি খানা, পর রুচি পর্‌না...'

এই পিচ্চি সক্রেটিসকে নিয়ে তো ভারি জ্বালা হলো। এর তো দেখি খাওয়া-দাওয়ায় কোনোই আগ্রহ নেই।

রিনিখালা বললেন, 'আমি সাধারণত তেলের খাবার খাই না। মুটিয়ে যাচ্ছি যা আজকাল!'

আমি ফিক করে হেসে উঠলাম। রিনিখালা দেখতে তরবারির মতো ধারালো। তাকে কেউ কোনোদিনও মোটা বলতে পারবে না। আর মোটকু মামার পাশে তাকে দেখা যাচ্ছে ঢাকের পাশে কাঠির মতো।

তিনি আমার হাসি দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তবে আজকে ঠিক করেছি আমি তেহারি খাব।'

'থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।' খুশি গোপন না করতে পেরে আমি বললাম রিনিখালাকে। এই দোকানের তেহারির নাম-ডাক সারা শহরে ছড়ানো। আর এই দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যাব অথচ তেহারিটা একটু চেখে দেখব না, সেটা খুব কাজের কথা হতো না।

দোকানটা মাঝারি আকারের। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। বাইরে একটা হাঁড়িতে তেহারি রাখা। সেখান থেকে প্লেটে প্লেটে তুলে ভেতরে বসা খদ্দেরদের পরিবেশন করা হচ্ছে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তেহারির গন্ধ নাকে এসে লাগল। ঘ্রাণেই অর্ধেক ভোজন হয়ে গেল প্রায়। আমরা খেতে বসলাম।

রিনিখালা বললেন, 'আমাকে কাঁটা-চামচ দিন।'

আমরা বেসিনে গিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম।

খাওয়া শুরু হলো। আসলেই তেহারিটা খেতে দারুণ। আমি আমার নিজের গতিতে খাচ্ছি। রিনিখালা খাচ্ছেন ধীরে ধীরে। টুটুল বলল, 'একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়ে বার্গার খেয়ে নিলেই হতো।'

আর মোটকু মামা? তিনি কোনো কথাই বলছেন না। তিনি কেবল খেয়ে চলেছেন। তার মুখ থেকে শুধু একটাই আওয়াজ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে খাদ্য গ্রহণের আওয়াজ। মুহূর্তেই তার থালা ফাঁকা। তিনি বলছেন, 'আরেক প্লেট দাও। শোনো কী এইসব সিংগেল প্লেট দিচ্ছ, ডাবল প্লেট করে দাও।'

আমার এক প্লেট শেষ হলো। ততক্ষণে মোটকু মামা গোটা ছয়েক প্লেট সাবাড় করে ফেলেছেন। আমরা হাত ধুয়ে এসে বসে পড়লাম। রিনিখালা টিসুপেপার দিয়ে সুন্দর করে মুখ মুছলেন।

আর মোটকু মামার খাওয়া কেবল শুরু হলো। তিনি বললেন, 'এই আরও কাঁচামরিচ আর লেবু দিয়ে যাও। আর একটার পর একটা প্লেট দিতে

থাকো। আমাকে চাইতে হচ্ছে কেন। আমি না বলা পর্যন্ত খাবার দেওয়া থামাবে না।'

মামার এই খাওয়া সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু হোটেলওয়ালাদের ছিল না। তারা প্লেটের পর প্লেট দিয়ে যাচ্ছে। তারপর এক সময় বেয়ারা করুণ মুখ করে বলল, 'আর নাই স্যার।'

মোটকু মামা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে করুণ সংবাদটি শুনলেন, 'কী বললে তুমি?'

'আর নাই স্যার।'

'আর নাই স্যার।'

'নাই মানে। কী নাই?'

'আর তেহারি নাই স্যার।'

'তেহারি নাই। তাহলে আমি খাব কী। আমি তো কেবল শুরু করেছি। তোমাদের হাঁড়িতে যথেষ্ট খাবার নাই, সেটা তোমরা আগে বলবা না মিয়া। এখন আধা পেটা খেয়ে উঠে যাওয়া যায়? দাও কী আছে দাও। বেশি করে কোক পেপসি এনে দাও। ওই সব খেয়েই পেট ভরাই।'

রিনিখালা হা হয়ে আছেন। তার হা করা মুখে এই বুঝি মাছি ঢুকে যায়! টুটুল দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'পৃথিবীতে মোটা মানুষ না থাকলে শুকনো মানুষও থাকত না! কেউ কেউ বেশি খায় বলেই বাকিরা খেতে পায় না।'

আমি হঠাৎ হাসতে শুরু করলাম। এই পরিস্থিতিতে না হেসে পারা যায়? একদিকে রিনিখালার হা হয়ে যাওয়া, অন্যদিকে টুটুলের দার্শনিকতা, মোটকু মামার ক্ষুধা না মেটার যন্ত্রণা– আর ওই দেখো হোটেলের বয়-বেয়ারা ম্যানেজারদের, তাদের চোখ কপালে উঠেছে, এতটা আশ্চর্য তারা জীবনেও হয়নি, এমন অদ্ভুত কাণ্ড তারা কখনও ঘটতে দেখেনি। একা একটা লোক হোটেলের তেহারি সাবাড় করে ফেলল, তেহারি ফুরিয়ে গেল!

তাদের সেই থ বনে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়েই আমি খিল খিল করে হেসে উঠলাম।

মামা বললেন, 'অয়ন। হাসির কী হলো। আমরা একটা সিরিয়াস এসাইনমেন্ট নিয়ে বেরিয়েছি। মনে থাকে যেন। এত হাসির কিছু নাই। চলো এখন বেরিয়ে যাই।' একটা দুই লিটারের কোল্ডড্রিংকসের বোতল থেকে এক ঢোক পানীয় মুখে ঢেলে তিনি উঠে পড়লেন।

বিল দিতে মোটকু মামার মোটেই অসুবিধা হলো না। ছোটখালার দেওয়া চকচকে নোটগুলো তো তার কাছেই আছে।

৪

আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় হাঁটছি। হঠাৎ দেয়া ডেকে উঠল। মেঘের গর্জন। ভালো করে তাকিয়ে বুঝলাম, মেঘ নয়, আমাদের মোটকু মামা ঢেকুর তুললেন।

আমরা আবার হাঁটছি।

কোনও যানবাহন পাচ্ছি না। এত হাঁটা যায়? এখনও দুপুর হয়নি। বেলা বাজে ১১টা। আমরা আসলে হোটেলে সকালের নাশতার হিসাবে বানানো তেহারির অবশিষ্টাংশ খেয়েছি। ফাল্গুন মাস। বসন্তের সকাল মধুর হওয়ার কথা। কিন্তু ঢাকা শহরে শীতকালেই শীত পড়ে না। মার্চ মাসটা রীতিমতো গরম। আর মোটকু মামার গরম বেশি। তিনি দরদরিয়ে ঘামছেন।

রিনিখালা বললেন, 'আমি আর হাঁটতে পারব না।'

এখন কী করা যায়? সদরঘাট পর্যন্ত যাওয়ার একটা উপায় বের করতে হবে। একটা কাজ করা যায়। বাসে ওঠা যায়। গুলিস্তান পর্যন্ত বাসে গেলে সমস্যার অন্তত অর্ধেক সমাধান হয়ে যায়।

আমরা একটা বাসে উঠলাম। আমাদের ভাগ্য ভালো। বাসে সিট পাওয়া গেল। মোটকু মামা পর্যন্ত একটা সিটে একাই বসে পড়লেন। কন্ডাক্টর তার দিকে তাকানো মাত্রই তিনি বললেন, 'আমি তিনজন প্যাসেঞ্জারের ভাড়াই দেব।' শুনে কন্ডাক্টর আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো।

রিনিখালা বসেছেন লেডিস সিটে। আমি আর টুটুল পাশাপাশি। বাস চলছে। বাসে সাধারণত আমাদের ওঠা হয় না। আজকে বাসে উঠে খুব ভালো লাগছে। জানালা দিয়ে ঢাকা শহরের দৈনন্দিন দৃশ্য অবলোকন করতে লাগলাম। হঠাৎই বিশাল শব্দ হলো। আর একটা ধাক্কা মতো লাগল। আমাদের গাড়ি একদিকে কাত হয়ে চলছে। আমার পিলে চমকে

উঠেছে। দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা এ ওর গায়ে পড়ে গিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ...পড়তে আরম্ভ করেছেন।

কী হলো কী হলো! বাস রাস্তার বাম দিকে দাঁড়াল।

লোকজনও হুড়মুড় করে নামছে। আমরাও নামলাম। আমি, টুটুল আর রিনিখালা। ব্যাপার কী? ব্যাপার হলো, বাসের চাকা পাঙ্কচার হয়ে গেছে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, এত মোটা মানুষ বাসে তুললে চাকা তো পাঙ্কচার হবেই।

ভারি অন্যায্য কথা। আমি একজন খুদে গোয়েন্দা। আমার অবশ্যই এই কথার প্রতিবাদ করা উচিত। আমি বললাম, 'শুনুন, মোটা মানুষটা না হয় তিনটা লোকের সমান। কিন্তু তিনটা লোক উঠলেই কি একটা বাসের চাকা ফেটে যাবে? খবরদার, এইভাবে বলবেন না। আর মামা বসেছেন বাসের ডান পাশে, আর আপনার চাকা ফেটেছে বাম পাশে, মামা বসেছেন পেছনে, চাকা ফেটেছে সামনে। এ জন্যে মামাকে দায়ী করা আপনাদের অন্যায় হচ্ছে।'

টুটুল আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস দৃষ্টি হেনে বলল, 'এই দুনিয়ায় দোষ করে একজন আর সাজা পায় একজন। যেন এর আগে আর কোনো বাসের চাকা ফাটেনি।'

কিন্তু মামা কই?

রিনিখালা বললেন, 'আচ্ছা, সুজন ভাইয়া কই। উনি তো নামেন নি।'

তাই তো সবাই নেমেছেন বাস থেকে। মামা নামেননি। রিনিখালা বাসে উঠে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তারপর আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, 'টুটুল, অয়ন, ওপরে এসো। তোমাদের মামা আটকে গেছেন।'

আমরা দ্রুত বাসে উঠলাম। মোটকু মামার অবস্থা সত্যি পেরেশান। সামনের সিটের সঙ্গে তার হাঁটু আটকে গেছে। তিনি আর কিছুতেই উঠতেও পারছেন না। বেরও হতে পারছেন না।

বাসের হেল্পার কন্ডাকটর সবাই এসে টানাটানি করতে লাগল। কিছুতেই আর মোটকু মামাকে ওঠানো যাচ্ছে না। শেষে হেল্পার বলল, 'এক কাজ করি, সামনের সিটটার নাটবল্টু খুইলা ফেলি। সিটটা সরাই। তাইলে

ওনারে বাইর করন যাইব। ঝামেলার মধ্যে ঝামেলা। কী বাসের চাকা পাল্টামু, এখন এই হাতিটারে...'

মামা ঠাস করে হেল্পারের গালে একটা চড় মেরে বসলেন। হঠাৎই চড় খেয়ে হেল্পার ভীষণ দুঃখ পেল। সে বলল, 'আমি ভাবছিলাম আপনেরে বাইর করুম। আর করুম না। থাকেন এইখানে আটকা।'

মামা বললেন, 'তোমাকে বের করতে হবে না। তবে আই এম রিয়েলি স্যরি যে তোমার গালে চড় বসিয়ে দিয়েছি।'

হেল্পার বলল, 'যতই স্যরি হন, আমি আর সিট খুলতাছি না।' সে নিচে নামতে নামতে গান ধরল, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, ফান্দ পাইতাছে ফান্দুয়া ভায়া পুঁটি মাছও দিয়া...'

তখন মামার চোখে-মুখে ফুটে ওঠা অসহায়ত্বটা যদি তোমরা দেখতে!

হেল্পার নিচে গিয়ে গাড়ির চাকা পাল্টানোর আয়োজন করছেন। আমরা তাকে 'আংকেল প্লিজ আংকেল প্লিজ' বলতে লাগলাম।

কিন্তু হেল্পার নির্বিকার। তিনি জ্যাক লাগাচ্ছেন গাড়ির নিচে। টায়ার বের করছেন। আর গান গেয়ে চলেছেন, 'বগার দুঃখে বগি কান্দেরে...

রিনিখালা বললেন, 'আমি জানি কী করে সুজন ভাইয়াকে বের করতে হবে।'

তিনি আবার বাসে উঠলেন। বললেন, 'সুজন ভাইয়া, আবার কিন্তু কাতুকুতু দেব। দিলাম কিন্তু।'

তিনি তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো শূন্যের মধ্যে দ্রুত নাড়তে লাগলেন। মোটকু মামার শরীরের দিকে নড়ন্ত রিনিখালার আঙুল ছুটে চলেছে। এখনি কাতুকুতু দেয়া হবে। কিন্তু না। মোটকু মামা কাতুকুতুর ভয়ে ঠাস করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সিটের নাট খুলে গেল। সামনের সিট ভেঙে সরে গেছে। মোটকু মামা এখন মুক্ত।

রিনিখালা হাসছেন। কাচভাঙা হাসি। হি হি হি।

আমরা বাস থেকে নামলাম। মামা বললেন, মনটা খুব খারাপ লাগছে রে। ছেলেটাকে চড় দিয়েছি। তিনি হেল্পার ছেলেটাকে ডেকে তার হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন। তারপর তার হাতে একটা একশ টাকার নোট দিয়ে

বললেন, 'ভাই, তুমি যে আমায় ক্ষমা করেছ, সেটার প্রমাণ হিসেবে এই টাকাটা তুমি রেখে দাও, প্লিজ।'

হেল্পার টাকাটা নিজের পকেটে রেখে দিলে মামা বললেন, 'থ্যাংক ইউ ভাইয়া।' মামার চোখে জল টলমল করছে।

এই রকম কোমল হৃদয় নিয়ে মোটকু মামা কী গোয়েন্দাগিরি করবেন, আল্লা মালুম।

গভীর আবেগে আমার চোখেও জল চলে এল।

৫

আমরা আবার হাঁটছি। সাড়ে ১১টা মতো বাজে। মাথার ওপরে সূর্য গনগন করছে। চোখেমুখে রোদ এসে সুইয়ের মতো বিঁধছে। একটা কিছু যানবাহন আমাদের দরকার। মোটকু মামার মোবাইল ফোনে ফোন এসে গেল। ছোটখালা ফোন করেছেন।

মামা বললেন, 'অয়ন, ধর তো। আপা কী বলে শোন।'

আমি ফোন ধরলাম। ছোটখালা বললেন, 'ওরে তোরা কোথায়? আমার গাড়িটা উদ্ধার করতে পারবি তো? নাকি। না হলে কিন্তু আমি আর বাঁচব না।'

আমি বললাম, 'ছোটখালা, গাড়ির সাথে বাঁচামরার কোনো সম্পর্ক নাই। তবে আমরা যখন ব্যাপারটা হাতে নিয়েছি, এস্পার ওস্পার একটা কিছু করে ছাড়বই।'

ছোটখালা বললেন, 'সেবার ওই যে দৈনিক জবর খবর পত্রিকা অফিসে গিয়ে তোরা কী সাংঘাতিক গোয়েন্দাগিরিই না করেছিলি।'

আমি বললাম, 'সবটাই তো অভিজ্ঞতা খালা। সেইসব অভিজ্ঞতা থেকেই তো আমরা আজ এত বড় গোয়েন্দা হয়ে গেছি।'

মামা বললেন, 'আপা কী নিয়ে কথা বলছে রে?'

'ওই যে জবর-খবর ঘটনা?'

'চেপে যা চেপে যা।' মামা বললেন।

না চেপে যাওয়া গেল না। রিনিখালা চেপে ধরলেন, 'বলো না অয়ন দৈনিক জবর খবরে কী হয়েছিল।'

অগত্যা বলতেই হলো।

দৈনিক *জবর খবর* একটা পত্রিকা। ওই অফিসে কে বা কারা একবার ঢুকে পড়ে জিনিসপত্র তছনছ করেছিল। কে ঘটিয়েছে ঘটনা, ওরা জানে না। তো পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোটকু মামার কোনো বন্ধুর বড় ভাই। কথায় কথায় মামা সেই ঘটনা জানতে পারলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা আপনার এই রহস্য তদন্ত করে দেখব। নিশ্চয়ই আমরা রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হব।'

তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে মামা গেলেন দৈনিক *জবর খবর* অফিসে।

সম্পাদক সাহেব কাঁচা-পাকা চুলের অমায়িক ভদ্রলোক। আমরা গিয়েছিলাম সন্ধ্যার পর। তখন পত্রিকা অফিস ছিল ভীষণ ব্যস্ত। সম্পাদক সাহেব আমাদেরকে নিউজ আর পেস্টিং বিভাগের পাশে একটা রুমে বসতে দিলেন। বললেন, 'তোমরা একটু বসো। আমি একটু দুটো খবর পড়ে দিয়ে আসছি। এখন আসলে আমাদের পেস্টিংয়ের সময়।'

তিনি আমাদের একটা রুমে বসিয়ে চলে গেলেন। এখন ওই রুমের নিয়ম ছিল, দেয়ালে একটা সুইচ আছে দরজার পাশে, সেটা না টিপে দরজা খোলা যায় না। আমরা সেটা জানতাম না। আমরা রুমে বসে আছি।
কী কারণে যেন ওই ঘরের লাইট ফিউজ হয়ে গেল।

ঘরটা অন্ধকার। তবে পাশের রুমের আলো দরজার নিচ দিয়ে আর ভেন্টিলেটর দিয়ে আসছিল। মোটকু মামা তো গোয়েন্দা। তাঁর সব ধরনের প্রস্তুতিই থাকে। তিনি তার পকেট থেকে টর্চ লাইট বের করলেন। হাতব্যাগ থেকে বের করলেন মোমবাতি আর দিয়াশলাই। ঘরে এখন একটা মোমবাতির আলো।

আমি একবার দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। দেখি দরজা খুলছে না।

সেই আধো অন্ধকার পরিবেশে পাশের ঘর থেকে নানা সংলাপ ভেসে আসছে। সবচেয়ে ভয়াবহ সংলাপগুলো এই রকম:

'এই, খুনটা কে করবে?'

'কেন? মইনুলের তো করার কথা? করেনি? এই মইনুল। খুনটা করছ?'

'না হায়দার ভাই। এখনও করতে পারিনি।'

'হেই মিয়া, একটা খুন করতে কতক্ষণ লাগে। করো তাড়াতাড়ি।'

'করতেছি হায়দার ভাই।'

আমি আর মোটকু মামা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। কী হচ্ছে এখানে?

কে কাকে খুন করবে? ঘরটা আলো আঁধারিতে ভরা। দরজা খুলতে পারছি না। এর মধ্যে এ কী কথা শুনছি।

তারপর পাশের রুম থেকে ভেসে আসতে লাগল এই ধরনের সংলাপ:

'এই মাথাটা কাট না!'

'না, মাথা কেন কাটব। বুক বরাবর তো কাটছি।'

'আচ্ছা তাইলে আরেকটু উপরে কাট। গলার নিচটা কাট।'

'না না। গলাটা বাঁচাই। বুকের ওপরটা কাটি।'

'আচ্ছা। হইছে একটা সাইজ। শোন। মাথার ওপরটা দে ছেঁটে। চালা কাটার।'

'আচ্ছা। চালাইতেছি।'

'এহ। কানটাও কেটে ফেললি।'

ভয়ে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। মামা বললেন, 'এ কোথায় এসে পড়লাম রে। মাসুদ রানার তো পকেটে রিভলভার থাকে। আমাদের তো সাথে কোনো অস্ত্র নাই।'

আমি বললাম, 'মামা, আমার ভয় লাগছে।'

মামা বললেন, 'ওরে ভয় পাস নে। তোর সাহসেই আমার সাহস। তুই ভয় পেলে আমি তো ভয়ে মরেই যাব।'

হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ হলো। কী ব্যাপার। গুলিটুলি হলো নাকি? তারপর দরজার নিচ দিয়ে রক্ত এসে ঢুকল আমাদের ঘরে।

মামা ঠাস করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি দরজা খোলার চেষ্টা করছি পারছি না।

মামার পকেট থেকে মোবাইল বের করে আমাদের বাসায় ফোন করলাম। মাকে বললাম, 'মা, আমরা দৈনিক *জবর খবর* অফিসে আটকা পড়ে আছি। এখানে ভীষণ খুনোখুনি হচ্ছে। গোলাগুলি হচ্ছে। আমরা বোধ হয়

আর বাঁচব না। আমাদের জন্য দোয়া কোরো। বিদায় মা।' শুনে মারও নাকি দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল।

আমি এখন কী করব? বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করব। তাহলে যদি খুনিরা রিভলভার হাতে এই ঘরে ঢুকে পড়ে?

তাহলে তো রক্ষা নেই। কিন্তু মামাকেও তো বাঁচাতে হবে। মোটা মানুষ।

আমি মামার মোবাইল ফোনের ফোন নম্বরগুলো চেক করতে লাগলাম। দেখলাম পুলিশ এমার্জেন্সির নম্বর আছে। আমি ফোন করলাম। একটা মোটা গলার লোক ফোন ধরল। আমি বললাম, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে বলল, 'পুলিশ এমার্জেন্সি বলুন।'

আমি বললাম, 'আমি দৈনিক জবর খবর থেকে বলছি। এখানে খুব খুনোখুনি গোলাগুলি চলছে। আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন।'

'আপনি কে বলছেন?'

আমি বললাম, 'আমি? আমি সম্পাদকের ভাগ্নে।' (মামার বন্ধুর বড় ভাই। সম্পাদক স্যার তো আমার মামাই হবেন।)

'আচ্ছা আমরা ফোর্স পাঠাচ্ছি।' ও পাশ থেকে বলা হলো।

'তাড়াতাড়ি করুন। আমরা মারা যাচ্ছি।'

একটু পরে দরজা খুলে গেল। সম্পাদক মামা এসে হাজির। বললেন, 'কী অবস্থা ঘর অন্ধকার কেন। আর দরজার নিচে কে কী ফেলেছে। এই, এইসব কী?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম,'রক্ত। যা খুনোখুনি হয়ে গেল।'

একজন পিয়ন মতো লোক বললেন, 'স্যার পাশের ঘরে একটা দুই লিটারের কোকের বোতল হাত থাইকা পইড়া ফাইটা ভাইঙ্গা গেছে। সেইটা দরজার নিচ দিয়ে এসেছে।' (আর আমরা দুজন কোককে রক্ত ভেবেছিলাম।)

আমি বললাম, 'স্যার, পাশে কে যেন কার গলা কাটছিল। বুক কাটছিল। কান কাটছিল। আর ওই পাশ থেকে তারও আগে বলছিল, এই, খুনটা কে

করবে। মইনুল খুনটা করো। তারপরেই এই খুনোখুনি। আর তাই শুনে মামা ফিট হয়ে গেছেন ।'

'কী বলছ এই সব। কে কাকে খুন করবে?' সম্পাদক স্যার বিস্মিত।

আমি বললাম, 'আমি নিজ কানে শুনেছি, হায়দার ভাই বলছেন খুন করতে, মইনুল নামের একজন খুনটা করছিল। হায়দার ভাই নামের কেউ তাকে খুনটা করতে বলছিল।'

সম্পাদক স্যার হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন, 'আর কোককে ভেবেছিলে রক্ত।'

মামার চোখে-মুখে পানি ছিটানো হলো। মামা চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, 'আমি বেঁচে আছি, নাকি মরে গেছি।'

তারপর সম্পাদক স্যার আমাদের ঘটনা বুঝিয়ে দিলেন। আসলে হায়দার সাহেব হলেন বার্তা সম্পাদক। তিনি বিভিন্ন সহ-সম্পাদককে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মইনুল নামের সাংবাদিককে তিনি বলছিলেন, খুনের খবরটা ঠিকমতো সম্পাদনা করতে। তা-ই বলছিলেন, এই মার্ডারটা কে করবে। তার মানে মার্ডারের খবরটা কে এডিট করবে, সংশোধন করবে ইত্যাদি। আর গলা কাটা বুক কাটা কান কাটার আওয়াজটা আসছিল পেস্টিং রুম থেকে। ওইখানে ছবি কেটে কেটে বসানো হচ্ছিল। একটা ছবি বড় হয়ে গেছে। সেটা জায়গার মাপে আনার জন্যে ছবিটার বুক কাটতে হয়েছে। মাথার ওপরে কাটতে হয়েছে। এমনকি ছবিটার একপাশ থেকে কানও কেটে ফেলা হয়েছে।

আমরা পাশের রুমে বসে সেই আওয়াজটাই খালি শুনতে পাচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম সত্যিই কি মানুষের মাথা গলা কাটা হচ্ছে কিনা। তখনই ওই রুমে দুই লিটারের কোকের বোতল হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। ভীষণ জোরে শব্দ হয়। আমরা সেটাকে ভেবেছিলাম গুলির শব্দ। আর কোক যখন দরজার নিচ দিয়ে এই ঘরে চলে আসে, সেটাকে ভেবে বসলাম রক্তধারা। ব্যস, মামা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এরই মধ্যে দৈনিক *জবর খবর* অফিসে পুলিশ চলে এসেছে। কী ব্যাপার আপনাদের অফিসে নাকি ভীষণ গণ্ডগোল চলছে। গোলাগুলি।

কে খবর দিল পুলিশে?

আমিই দিয়েছি– আমি স্বীকার করলাম। ব্যাপক হাসাহাসির মধ্য দিয়ে আমাদের বিদায় দেওয়া হলো।

এই গল্পটা এখন রিনিখালাকে করলাম। রিনিখালা আবারও হাসতে লাগলেন। সঙ্গে হাসছে টুটুল। এরই মধ্যে আমরা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেছি।

ট্যাক্সিতে ওঠার পর গল্পটা আরও জমল ভালো।

গল্পের তালে তালে কখন যে আমরা বুড়িগঙ্গার তীরে এসে পড়েছি, টেরই পাইনি। ট্যাক্সি চালক বললেন, 'আইসা পড়ছি। এইখানে নাইমা নৌকায় উঠেন। খেয়ানৌকা পাইবেন। সোজাসুজি অন্য পারে চইলা যান। শর্টকাট হইব। ব্রিজ দিয়া গেলে অনেক দূর ঘুরতে হইব। কোনো দরকার নাই।'

আমরা ট্যাক্সিচালককে ভাড়া আর ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলাম।

৬

বুড়িগঙ্গার তীর। এখান থেকে নদী দেখা যাচ্ছে। নদীভরা নৌকা আর নৌকা। আর ওইদিকে তাকিয়ে দেখো, কত লঞ্চ। কী বড় বড় লঞ্চ। আর এ পাশের রাস্তায় যানজট। মামার পকেটে মজিদ ড্রাইভারের ঠিকানা। রোজ সকালে মজিদ ড্রাইভার এতদূর থেকে গিয়ে খালাদের বাসায় ডিউটি করে! আহা বেচারা। কোন্ কাকডাকা ভোরেই না তাকে উঠতে হয়।

খেয়ানৌকাগুলো ছোট ছোট। একটায় ৬ জন করে উঠতে হয়। আমরা রাস্তা থেকে নেমে ধীরে ধীরে নদীর কিনারে গিয়ে পৌঁছলাম। লোকজন পিলপিল করে পিঁপড়ার সারির মতো যাচ্ছে আর নৌকায় উঠছে। তাদের কারো কারো মাথায় জিনিসপাতির বোঝা, কারো হাতে থলে, কারও কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ।

আমরা ঠিক করলাম, চারজন এক নৌকায় উঠব। প্রত্যেকের জন্য ভাড়া দুইটাকা। তবে আমাদের চারজনের জন্যেই ১২ টাকা ভাড়া সাব্যস্ত হলো। মোটকু মামা তো একাই তিনজনের সমান।

রিনিখালা বললেন, 'তা হতে পারে। কিন্তু আমার ওজন তো হাফ। আমার জন্যে এক টাকা নিন।'

মাঝি বললেন, 'তা হবে না। ছেলে বুড়া, মাইয়া মানুষ পুরুষ মানুষ সব দুই টাকা।'

টুটুল বলল, 'তাহলে মোটকু মামার জন্যে ৬ টাকা কেন।'

মাঝি হেসে বললেন, 'ওনার কথা। ওনার কথা আলাদা।'

মামা চোখ টিপলেন। এর মানে হলো, চেপে যা। এই সামান্য বিষয় নিয়ে ঝামেলা বাধাস নে।

রিনিখালা মিটমিট করে হাসছেন।

টুটুল কবিতা থেকে আবৃত্তি করে বলল, 'মা যদি হও রাজি, বড় হলে আমি হব খেয়াঘাটের মাঝি।'

মাঝি বললেন, 'তা কেন হইবেন চাচা। বড় হইয়া যদি কিছু হইতেই চান, তাইলে মোটর গাড়ির ড্রাইভার হইয়েন। ট্রেনের ড্রাইভার হইয়েন। খেয়াঘাটের মাঝির কোনো সম্মান নাই। ড্রাইভারের সম্মান আছে। তা গো সবাই ওস্তাদ কইয়া ডাকে।'

শুনে আবার রিনিখালা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

মামা বললেন, 'মিস রিনি, এইভাবে হাসবেন না। নৌকা দুলে উঠতে পারে। ডুবে যেতে পারে। তাহলে কিন্তু এইখানেই ভবলীলা সাঙ্গ। সবার সলিল সমাধি হয়ে যাবে।'

রিনিখালা হাসি থামালেন।

তখন মাঝি বললেন, 'আপায় হাসলে নৌকার কিছু হইব না। নৌকা দুলবও না। ডুববও না। আপনে হাসলে খবর আছে। নৌকা দুইলা ডুইবা যাইব। আপনে হাইসেন না।'

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রিনিখালা হি হি করে হেসে উঠলেন।

মোটকু মামা চোখ পাকালেন। কিন্তু রিনিখালা তাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না।

টুটুল বলল, 'মানুষের জীবনটাও একটা জার্নি। আমাদের সবাইকে জীবনের নদী পার হতে হয়।'

মামা বললেন, 'টুটুল, ফিলোসফি ঝেড়ো না। শক্ত হয়ে বসে থাকো। ফট করে পানিতে পড়ে গেলে সব ফিলোসফি পানিতে গলে যাবে। আমি সাঁতার জানি না। তোমাকে তুলতে পারব না।'

রিনিখালা বললেন, 'আমি সাঁতার জানি। কিন্তু আমি এই নোংরা পচা পানিতে জীবনেও নামব না। বুড়িগঙ্গার পানি যে এত দূষিত আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আর কী যে পচা গন্ধ। উফ। মানুষ নদীটাকে মেরেই ফেলেছে প্রায়।'

টুটুল বলল, 'তুমিও তো একটা ফিলোসফারের মতো কথা বললে রিনিখালা। মানুষ আর নদী, দুটোরই জীবন থাকে। নদী এক কূল ভাঙে এক কূল গড়ে। মানুষের জীবনও তাই।'

মামা বললেন, 'টুটুল, ফিলোসফি থামাও। তোমার খালা যেটা বলছেন সেটা পরিবেশের কথা। আমরা আমাদের নদীগুলোকে ভীষণভাবে দূষিত করেছি। নদীতে সব ধরনের বর্জ্য মেশাচ্ছি। কারখানার বর্জ্য, ড্রেনের পানি। এটা ঠিক না।'

আমরা নদীর অন্যপারে এসে গেছি। আমি আর টুটুল লাফিয়ে নৌকা থেকে নেমে ঘাটে পা রাখলাম।

মামা খুব সাবধানে নামলেন। টুটুল বলল, 'মামা সাবধান। হাতি কাদায় পড়লে কিন্তু ব্যাঙও লাথি মারে।'

কিন্তু রিনিখালা নামতে পারছেন না। তিনি নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে চিচি করছেন। ব্যাপার কী? রিনিখালা এই নোংরা কাদামাটিতে কিছুতেই পা রাখবেন না।

অগত্যা মামা দু হাত বাড়ালেন। রিনিখালাকে পাঁজাকোলা করে ধরে নামিয়ে আনলেন তিনি। তাকে একেবারে পিচঢালা রাস্তায় এনে কোল থেকে নামালেন।

আমি আর টুটুল পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

রিনিখালা বললেন,'ধন্যবাদ।'

মামা বললেন, 'ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। গোয়েন্দাদের জীবনে এই ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটে থাকে। বিশেষ করে মাসুদ রানা আর জেম্‌স বন্ডের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে...'

টুটুল কাশি দিলে মামা থামলেন।

আমরা ছোটখালার ড্রাইভার মজিদের বাসা খুঁজছি। বাসার ঠিকানা লেখা কাগজ মামার পকেটে। কাগজটা বের করে একটা চায়ের দোকানে দেখানো হলো। ওঁরা দেখিয়ে দিলেন বাসাটা কোনদিকে হতে পারে।

মজিদের বাসা খুঁজে পেতে মোটেও দেরি হলো না। একটা বস্তিঘর ধরনের বাসা। মেঝে পাকা, দেয়ালও পাকা। ওপরে ঢেউটিন। বাসাটা খুঁজে বের করার পর মামা বললেন, 'আমাদের সবার বাসায় যাওয়া ঠিক হবে না। মিস রিনি একা যাবেন। তিনি গিয়ে বলবেন, তিনি এসেছেন ভোটার লিস্টের কাজে। মজিদ কোথায়। মজিদের গ্রামের বাড়ি কই। ফ্যামিলি মেম্বার কতজন সব জিজ্ঞেস করে কায়দা করে বের করতে হবে মজিদ

আসলে গাড়ি-চোরদলের সদস্য কিনা। আর যদি সত্যি ও গাড়ি চুরি করে বিক্রি করে দিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো বউ-বাচ্চাকে আগেই সরিয়ে ফেলেছে। অথবা হয়তো এখনও সরায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে ওদেরকে নিয়ে কেটে পড়বে। আপনি, মিস রিনি, পুরো ব্যাপারটা খুব ভালো ভাবে যাচাই করবেন। কথা বলবেন যেন ভোটের কাজেই এসেছেন।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা, আমি বোধ হয় রিনিখালার সঙ্গে থাকতে পারি।'

মামা বললেন, 'মিস রিনি ভোটার লিস্টের লোক। তুই কে?'

'আমি? আমি মিস রিনির লোক।' আমি বললাম।

মামা ডান হাতে মুঠো পাকিয়ে বাম হাতে কিল দিতে দিতে বললেন, 'হতে পারে। আচ্ছা যা তুই মিস রিনির সঙ্গে।'

আমি আর রিনিখালা বাসার গেটে গেলাম। মামা আর টুটুল বাইরে পায়চারি করতে লাগলেন। কোনো ডোরবেল খুঁজে পাওয়া গেল না। রিনিখালা টিনের দরজায় ধাক্কা মেরে বললেন, 'বাড়িতে কেউ আছেন নাকি? বাড়িতে কেউ আছেন?'

একজন মহিলা দরজা খুললেন। তার পায়ের কাছে একটা ছোট্ট বাচ্চা।

রিনিখালা বললেন, 'আমি এসেছি ভোটার লিস্টের কাজে।'

মহিলা বললেন, 'বাবুর বাপে তো বাড়িত নাই।'

রিনিখালা বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, উনি কোথায় গেছেন?'

মহিলা বললেন, 'ডিউটিতে গেছেন।'

রিনিখালা বললেন, 'ওনার নাম তো মজিদ তাই না?'

মহিলা বললেন, 'জি আবদুল মজিদ।'

'আপনি ওনার স্ত্রী?'

'জি। আমি ওনার পরিবার।'

'আপনার বাচ্চা-কাচ্চা কয়জন?'

'একজনই। বাবু।'

'উনি আজকে ডিউটিতে গেছেন কখন?'

'আজকা একটু তাড়াতাড়ি গেছে। আজকা নাকি কী কাম আছে! ডেলি তো ভাত খাইয়া যায়, আইজকা আর ভাত খাইয়া যাইতে পারে নাই।'

'কখন আসবেন উনি কিছু বলে গেছেন?'

'না। ড্রাইভারের চাকরির কি আসা-যাওয়ার টাইমের ঠিক আছে। যখন ডিউটি পড়ব তখনই করতে হইব।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে উনি আসবেন তো।'

'হ। তা আসব। মাঝে-মধ্যে বেশি রাত হইয়া যায়। তয় আসব ঠিকই।'

'আচ্ছা, উনি কি বলে গেছেন যে কয়েকদিন উনি ঢাকার বাইরে যাবেন ডিউটিতে?'

'না। তা তো কইয়া যায় নাই।'

'আচ্ছা আপনার নাম কী?'

'লতিফা বানু।'

'আচ্ছা আপনাদের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা জানেন।'

'জি জানি।'

লতিফা বানুর কাছ থেকে গ্রামের বাড়ির নাম ঠিকানা সব নিয়ে নিলেন রিনিখালা।

এরই মধ্যে আমি চারদিকে খেয়াল করলাম। তদন্ত কাজে লাগতে পারে এই রকম বিশেষ কোনো কিছু চোখে পড়ে কিনা। লতিফা বানু যখন কথা বলছিলেন তখন তিনি চোখের পাপড়ি বার বার বন্ধ করছিলেন কিনা। মিথ্যা কথা বলার সময় মানুষের চোখের পাতা কাঁপে।

বিশেষ সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

রিনিখালা লতিফা বানুকে ধন্যবাদ দিলেন। আমরা বেরিয়ে এলাম ওই বাড়ির চত্বর থেকে।

মামা আর টুটুল এদিকে একটা চায়ের দোকানে বসে পড়েছেন। সেখানে গরম গরম সিংগারা ভাজা হচ্ছে। মামা একটা করে সিংগারা ধরছেন। আঙুল দিয়ে সেটাকে ফাটাচ্ছেন। তাতে ফু দিচ্ছেন। ভেতর থেকে ভাপটা বেরিয়ে গেলে সেটা তিনি গলাধঃকরণ করছেন।

আমরা তাঁর কাছে গেলাম।

মামা বললেন, 'সকালের ব্রেকফাস্ট ভালো হয়নি। দুপুরের লাঞ্চটাও ভালো হচ্ছে না। ফেরার পথে আমরা অবশ্যই হাজির বিরিয়ানির দোকানে যাব। বিরিয়ানি খেতেই হবে।'

রিনিখালা বললেন, 'খালি খাওয়ার ধান্দা। এইভাবে কোনো ইনভেস্টিগেশন হয়?'

মামা বললেন, 'ভালো কথা? কী পেলেন?'

আমি বললাম, 'সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। সব কিছু নরমাল। শুধু আজকে মজিদ ড্রাইভার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছেন বাসায় একটা বিশেষ ডিউটি আছে বলে।'

মামা বললেন, 'তোরা আর কী পাবি? আমি এরই মধ্যে অনেক তথ্য পেয়ে গেছি। চোরাই গাড়ি ভাঙার কতগুলো গোপন ওয়ার্কশপ আছে নদীর ওইপারে। আমি সেসবের খোঁজ বের করে ফেলেছি।'

আমি বললাম, 'কী করে বের করলে?'

মামা বললেন, 'আরে তোরা তো আর ডিটেকটিভ না। ডিটেকটিভ হলাম আমি। পরে সব তোদের বলব।'

আমি বললাম, 'তোমার তথ্যগুলো আমাদের বলো। আমরা এনালাইসিস করি।'

মামা বললেন, 'সবটা বলা যাবে না। সময় এখনও আসেনি।'

টুটুল বলল, 'প্রতিটা জিনিসের একটা সময় আছে। এই জন্যে ধৈর্য্য ধরতে হয়। সবুরে মেওয়া ফলে।'

মামা বললেন, 'এই আরও সিংগারা ভাজো। আমরা আছি।'

তিনি পকেট থেকে মোবাইল বের করলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা দেখি তো মজিদের মোবাইলটা মজিদ অন করেছে কিনা।'

মামা তার মোবাইল ফোনের বাটন টিপতে লাগলেন।

তারপর কানে ধরে বলতে লাগলেন, 'রিং হচ্ছে! মজিদের ফোনে রিং হচ্ছে!'

হ্যালো, মজিদ?

.....

মজিদ না এইটা?

....

তাইলে আপনে কে?

....

আপনার নম্বর এইটা না?

....

তাইলে আপনার কাছে এই ফোন আসল কেমন করে?

...

কী বললেন। আপনারা ফোন চুরি করেন?

....

মজিদ নামের এক ড্রাইভারের ফোন এইটা। এই ফোন সেটের তো দামও বেশি না।

....

তাইলে এইটা চুরি করে আপনার লাভ?

....

আচ্ছা আমরা ফোন সেটটা ফেরৎ চাই। আপনি কোথায় আছেন বলেন। আমরা আপনাকে টাকা দিয়ে ফোন সেটটা ফেরৎ নেব। কারণ এটার মধ্যে আমাদের দরকারি অনেক নম্বর আছে।

.....

কোথায় যাব বললেন? রায়ের বাজার বাঁধের উপরে? না, না, পুলিশে বলব না। পুলিশকে বলব কেন। আপনারা একটা মহৎ কাজ করবেন। চোরাই ফোন দয়া করে আমাদের ফেরৎ দেবেন। আর আমরা পুলিশে বলব। এত বোকা নাকি আমরা? তাহলে কি আর আপনারা ফোন ফেরৎ দেবেন? দেবেন না!

....

আমরা ফোনটা পেতে চাই। আপনে ফোনটা খোলা রাইখেন। আচ্ছা রাখি।

এর মধ্যে গরম সিংগারা চলে এসেছে। মামা কি আর এখন সিংগারা রেখে ফোনে কথা বলবেন। আরো গোটা কয়েক সিংগারা পেটের অনন্ত ভাণ্ডারে চালান করে দিয়ে তিনি বললেন, 'বুঝলি তোরা কিছু?'

আমি বললাম, 'কিছু কিছু।'

'আরো একটা ক্লু পাওয়া গেল। ফোনটা অন রাখতে বলেছি। পুলিশকে দিয়ে ফোনটা ট্র্যাক করতে হবে। তাহলে ধরা পড়ে যাবে পুরো গ্যাংটা। বমাল গাড়ি চোর চক্র গ্রেপ্তার।'

আমরাও একটা করে সিংগারা খেলাম। তবে রিনিখালা কিছু খেলেন না। উনি বললেন, 'ভালো আইসক্রিমের দোকান পেলে আমি আইসক্রিম খাব।'

আমি আর টুটুল একযোগে বলে উঠলাম, 'আমরাও।'

মামা সিংগারার বিল পরিশোধ করলেন। এই সময় তার মোবাইল ফোন আবার বেজে উঠল।

ফোন করেছেন ছোটখালা।

মামা বললেন,'হ্যাঁ ছোটআপা। বলো। তোমার গাড়ি এবার উদ্ধার হয়েই যাবে। ধরো গাড়ির ফিফটি পারসেন্ট উদ্ধার করে ফেলেছি।'

তারপর মামা ফোনটার স্পিকার অন করলেন। ছোটখালা কী বলবেন, এখন থেকে আমরা শুনতে পাব।

ছোটখালা বললেন, 'পুরোপুরি না হান্ড্রেড পারসেন্ট...।'

মামা বললেন, 'হ্যাঁ। হান্ড্রেড পারসেন্ট উদ্ধারের পথে আমরা ফিফটি পারসেন্ট এগিয়ে গেছি।

'আরে গাধা আগে কথাটা শোন। গাড়ি পেয়ে গেছি।' ছোটখালা বললেন।

'গাড়ি পেয়ে গেছ মানে?'

'মজিদ গাড়ি নিয়ে বাসায় চলে এসেছে।'

'কী বলো? তাহলে ও গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিল?'

'গাড়ির কাগজ করতে। রেজিস্ট্রেশন রিনিউ করেছে, ফিটনেস সার্টিফিকেট এনেছে, ট্যাক্স টোকেন এনেছে।'

'তাহলে তুমি যে বললে ও গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।'

'আমাকে বলে যায়নি, তাই আমি ভেবেছিলাম গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। এখন তো তোর দুলাভাই বলছেন উনিই নাকি মজিদকে বলে রেখেছিলেন আজকের দিনে যেন গাড়ির কাগজ করাতে মজিদ গাড়ি নিয়ে যায়। কালকেও নাকি মজিদের সঙ্গে তার মোবাইলে কথা হয়েছে।'

'তাহলে দুলাভাই আজকে ভুলে গেলেন কেন?'

'কী একটা সেমিনারে ছিল। কাজের চাপে সব ভুলে বসেছিল।'

'আর তাহলে মজিদ মোবাইল বন্ধ করে রেখেছিল কেন?'

'ওর মোবাইল নাকি চুরি হয়ে গেছে। গাড়িতে মোবাইল রেখে ও নাকি জানালার কাচ খুলে কী একটা কাজে আরেক দিকে গেছল, এক মিনিট পরেই এসে দেখে মোবাইল নাই।'

'ধেত্তেরি। তুমি যে কী হয়রানি করতে পারো মানুষকে।' মামার কণ্ঠে বিরক্তি।

'কোনো মানে হয়?' আমি বললাম।

টুটুল বলল, 'অবশ্যই মানে হয়। একটা নতুন জায়গা দেখা হলো। নৌকায় করে বুড়িগঙ্গা পার হওয়ার অভিজ্ঞতা হলো। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।'

টুটুলের ফিলোসফির চর্চাটা বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হয়ে যাচ্ছে। ওর চশমাটা টেনে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দেব নাকি?

সারাটা দিন পণ্ডশ্রম কম তো হলো না। কোনো মানে হয় না। কোনোই মানে হয় না।

এবার আমাদের ফেরার পালা। আবার নৌকা করে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিতে হবে।

৭

আবার নৌকায় উঠে বসেছি। মামার দেখি আমাদের দিকে খেয়াল নেই। তিনি রিনিখালাকে হাত ধরে যত্ন করে নৌকায় তুলছেন। আমরা নিজেরাই নৌকায় উঠে মাঝখানের পাটাতনে বসে পড়লাম। একবার তো নৌকা করে এই পারে এসেইছি। এখন জানি ব্যাপারটা মোটেও ভয়ের কিছু নয়। তবে সাবধানের মার নেই। গোয়েন্দাদের সারাক্ষণই সাবধান থাকতে হয়। আর রাখতে হয় চোখকান খোলা।

এবার আমাদের নৌকা পাল্টে গেছে। নৌকার মাঝিও পাল্টে গেছে।

সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে। তবু রোদের তেজ কম নয়। দূরের লঞ্চগুলোকে পুকুরের জলে রাজহাঁসের মতো লাগছে। আর ওই দিকে দেখো, কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আকাশ কালো করে ফেলছে। এইসব কারখানার রাসায়নিক মিশ্রিত পানিও এসে মিশছে বুড়িগঙ্গায়।

টুটুল বলল, 'আচ্ছা অয়ন বল তো, একশ বছর আগে এই নদীর নাম কী ছিল?'

আমি বললাম, 'কেন, বুড়িগঙ্গাই।'

টুটুল বলল, 'পাগল। একশ বছরের বুড়ি কি একশ বছর আগেও বুড়ি ছিল? তখন এর নাম ছিল শিশুগঙ্গা।'

আমি বললাম, 'যাহ্।'

টুটুল বলল, 'যাহ্ বললি যে। মামাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।'

আমি বললাম, 'মামা, বুড়িগঙ্গার নাম কি আগে শিশুগঙ্গা ছিল?'

মামা বললেন, 'কমলা গাছে যখন কমলা ধরে, তখন তো তার রং কমলা হয় না। হয় সবুজ। পাকলে পরে সেটা কমলা হয়। তখন কি কমলার নাম সবুজ হয়?'

'না তা হয় না।' আমি বললাম।

'আর ধর, একটা গোলাপের রং সাদা। তাই বলে কি আমরা সাদা রংকে গোলাপি বলতে পারব? যদিও সাদা রঙের অনেক গোলাপ জগতে আছে!'

'না, পারব না।'

'তেমনি খোকাভাই যখন বুড়ো হয়, তখনও তো তার নাম খোকাই থাকে, নাকি?'

'তা থাকে।'

'তাহলে বুড়িগঙ্গা যখন ছুড়ি ছিল, তখনও তার নাম বুড়িগঙ্গাই ছিল।'

আমি বললাম, 'সেটাই তো আমি বলছি। কিন্তু টুটুল তো তা বলে না।'

টুটুল বলল, 'নিশ্চয়ই আমি শিশুগঙ্গাকে বুড়ি বলতে পারব না। যেমন একশ বছর আগে পুরোনো ঢাকার নাম পুরোনো ঢাকা ছিল না। তখন ওটাই ছিল নতুন ঢাকা। তাই না?'

রিনিখালা বললেন, 'আমি তোমাদের আলোচনা এনজয় করেছি। এখন থামো। কারণ আমরা ঘাটে এসে গেছি।'

৮

কিন্তু নৌকা পুরোপুরি ঘাটে ভিড়তে পারল না। ঘাটে নৌকার ভিড়। তেমনি একটা নৌকার গায়ে আমাদের নৌকাও ভিড়েছে। আমরা এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় চড়ে সেখান থেকে আরেক নৌকায় চড়ব। এইভাবে আমাদের তীরে পৌঁছাতে হবে।

আমি আর টুটুল লাফিয়ে লাফিয়ে এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় যেতে লাগলাম। রিনিখালা আমাদের পেছনে আস্তে আস্তে সাবধানে আসতে লাগলেন। বোঝাই যাচ্ছে, এই নোংরা পানির একটা ফোঁটাও তিনি শরীরে লাগাতে চান না।

আমরা তীরে পা রাখলাম।

মামা তার মানিব্যাগ বের করে মাঝির হাতে পুরো ২০ টাকার একটা নোট দিয়ে বললেন, 'বাকিটা রেখে দিন।'

এবার তিনি ওই নৌকা ছেড়ে আরেক নৌকায় উঠবেন। যেই না তিনি নৌকার একপাশে দাঁড়িয়েছেন, অমনি নৌকাটা সেই দিকে কাত হয়ে গেল। চোখের পলকেই ঘটে গেল সব। নৌকা কাত হলো, উল্টে গেল। আর পানির মধ্যে ঝপাস করে পড়ে গেলেন মামা। আর কী যে শব্দ উঠল ওই কালো নোংরা পানিতে। মনে হলো, একটা তিমি মাছ লাফিয়ে উঠে আবার পড়ে গেল জলে। তিমি মাছ নাকি জলহস্তি?

মামা 'ওরে বাবারে মারে আমাকে বাঁচাও রে' বলতে বলতে পানিতে ডুবে যেতে লাগলেন।

রিনিখালা চিৎকার করতে লাগলেন, 'সেভ হিম। সেভ আ লাইফ। কে আছেন, এগিয়ে আসুন। ওই মোটা ভদ্রলোককে পানি থেকে তুলুন।'

নৌকার মাঝিও পানিতে পড়ে গেছেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'মোট্‌কু ভাইজান, পানি কম, আপনে খাড়ান, আপনে খাড়ান। পায়ের নিচে মাটি পাইবেন, আপনে খাড়ান।'

মামা তবু ডুবে যাচ্ছেন। আমার কান্না পাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম, 'মামা মামা তুমি ডুবে যেও না। তুমি দাঁড়াও।'

টুটুল বলল, 'পায়ের নিচে মাটি থাকাই আসল। মামা, দাঁড়ান।'

মামা ডোবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। কারণ আসলেই জায়গাটায় কোমর পানি। তিনি এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মাঝি বললেন, 'এইবার সোজা হাঁইটা পাড়ে গিয়া উঠেন মিয়া।'

মামা বললেন, 'আমার হাত ধরে নিয়ে চলুন প্লিজ। আমি একা একা পারব না।'

এইবার ভেজা দেহে মামা যখন তীরে উঠলেন, তখন তাকে সত্যি সত্যি একটা জলহস্তির মতোই লাগছে।

আহ। কী তার রূপ। তার ভেজা শরীর থেকে বুড়িগঙ্গার দূষিত পানি ঝরে পড়ছে।

মামা উঠে বললেন, 'আহ। কী যে গরম লাগছিল। এতক্ষণে শরীরটা একটু জিরোলো।'

রিনিখালা বললেন, 'শোনেন সুজন ভাইয়া, আপনার ২০ গজের মধ্যে আমি আসছি না। এই নোংরা পানি যার শরীরে লেগেছে, তাকে আগাপাশতলা একটা ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে ৭ বার ধোওয়া হলেও আমি তার কাছে যাব না।'

মামা বললেন, 'সে বড় দুখের কথা হবে।'

রিনিখালা বললেন, 'তবে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই আপনি যে ডুবে মরেননি।'

টুটুল বলল, 'মোটকু মামা পানিতে ডুবে মরলে ভারি অসুবিধা হতো। এমনিতেই উনি মোটা, তার ওপরে পানি খেয়ে উনি আরো ঢোল হয়ে যেতেন। ওনার লাশ তুলতে ক্রেন লাগত।'

মামা বললেন, 'সেইসব কথা বিবেচনা করেই আমি এ যাত্রা বেঁচে উঠেছি। শোনো, আমরা হলাম গোয়েন্দা। নানা বিপদের ঝুঁকির মধ্যেই আমাদের চলাফেরা করতেই হয়। পদে পদে আমাদের ডাকে মৃত্যু, হাতছানি দিয়ে। আমরা কোনো কিছুকেই ভয় পাই না। ভয় পেলে আমাদের চলে না। মাসুদ রানা কতবার সাগরে ডুবে মরতে বসেছেন। তাই বলে কি তিনি অভিযান বন্ধ করে দিয়েছেন?'

'না দেননি।' আমি বললাম।

'আর আমি তো পড়ে গেছি সামান্য বুড়িগঙ্গায়। এতে কি বিচলিত হলে আমাদের চলবে?'

'না মামা চলবে না।' আমি বললাম।

'রাইট। বিপদে কী করতে হবে?' মামা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।'

'বুড়িগঙ্গার পানির মতো ঠাণ্ডা।' রিনিখালা ফোঁড়ন কাটলেন।

'রাইট।' মামা হতোদ্যম না হয়ে বললেন, 'এখন আমাদের কর্তব্য হবে একটা হোটেল খুঁজে বের করা। আর কাপড়ের দোকানে গিয়ে কাপড়চোপড় কেনা।'

রিনিখালা বললেন, 'কিন্তু সুজন ভাইয়া। সবার কাপড় পাওয়া গেলেও আপনার মাপের কাপড় তো পাওয়া যাবে না। তাই না?'

'সেটা একটা সমস্যা হবে বটে।' মামা হতাশ ভঙ্গিতে বললেন।

রিনিখালা বললেন, 'একটাই উপায় আছে। আপনি একটা বড়সড় লুঙ্গি কেনেন। তবে আপনি এত মোটা যে হয়তো গিট দিতে পারবেন না। তা না পারেন তবুও এই নোংরা কাপড় চোপড় ছাড়েন। আর বড়সড় পাঞ্জাবি কিনে নেন। সেইটা আপনার গায়ে ফিট করতে পারে।'

পথের ধারেই অনেক লুঙ্গির দোকান। লুঙ্গি সহজে পাওয়া গেল। কিন্তু পাঞ্জাবি? সেটা কোথায় পাওয়া যাবে?

দোকানি বলল, 'আপনারা পাঞ্জাবি খুঁজতাছেন কেন? ওনার লাইগা? ওনার লাইগা সুবিধা হইব বিদেশী গার্মেন্টসের জিনিস কিনেন। ওই একটা মোড় ঘুরলেই পাওয়া যাইব। সব ডাবল সাইজ। ওনার মতো লোকের

লাইগাই। আমগো দ্যাশে তো খাওন নাই, তাই সব শুকনা, বিদেশে লোকে খালি খায় আর ওনার মতো মোটা হয়। যান। পাইবেন।'

সত্যি বিদেশে রপ্তানির জন্যে তৈরি গার্মেন্টসের পোশাকের একটা দোকান পাওয়া গেল। সেখানে মোটকু মামার সাইজের প্যান্ট শার্ট দুটোই মিলল। সেসব নিয়ে আমরা চললাম একটা হোটেলের সন্ধানে। একটা হোটেলও পাওয়া গেল। হোটেলের নাম দি অভিলাষ হোটেল। আবাসিক।

সেই হোটেলে একটা রুম আমরা ভাড়া করলাম শুধু মামাকে গোসল করানো হবে বলে।

রিনিখালা মামার জন্যে কিনে আনলেন দুটো সাবান। একটার নাম আলমের এক নম্বর পচা সাবান। আরেকটার নাম ডেটল সাবান। প্রথমে পচা সাবানটা তিনি তুলে দিলেন মামার হাতে। বললেন, 'আপনার মতো লোককে আসলে আলমের এক নম্বর পচা সাবান দিয়েই গোসল করানো উচিত। নিন।'

মামা বললেন, 'এটা তো কাপড় কাচা সাবান। আমি এখন কাপড় কাচতে পারব না।'

'আপনাকে কাপড় কাচার জন্যে এই সাবান দেওয়া হয় নাই। আপনার নিজেকে কাচার জন্যই দেওয়া হয়েছে।'

'সে কী? আমি কি কাপড়?'

'আপনাকে কাপড়ের মতোই ধোলাই করা উচিত। আর এই নিন ডেটল সাবান। এইটা দিয়ে ভালো করে গোসল করবেন।'

আমরা হোটেলের রিসেপশনে এসে বসলাম।

মামা হোটেল রুমের বাথরুমে ঢুকে পড়লেন।

৯

হোটেলটা দোতলায়। নিচতলায় কতগুলো অফিস-আদালত। আমরা রিসেপশনে বসে আছি। একজন ভদ্রমহিলা (রিনিখালা), আর দুটো বাচ্চা ছেলে (আমরা)। কেউ আমাদের পাত্তা দিচ্ছে না। রিসেপশনে ধুপকাঠি জ্বালানো। বিশ্রি গন্ধ আসছে। আর ধোঁয়ায় আমাদের শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই হোটেলেই আমরা বড় কোনো গোয়েন্দা অভিযানের ক্লু পেয়ে যাব। সত্যিই, তাই হলো।

এখানে বসেই আমরা, আমি আর টুটুল একটা ভয়ঙ্কর জিনিস আবিষ্কার করে ফেললাম। প্রথমে জিনিসটা নজরে পড়ল আমারই। আমি ইশারায় টুটুলকে বললাম জিনিসটা খেয়াল করতে।

একজন বোরখা পরা মহিলা রিসেপশনের সামনে দিয়ে হেঁটে পাশের করিডোরে গেলেন। তার বোরখার পেছন দিকটা কোনো কারণে উঠে গেছে। আর বোরখার নিচে দেখা গেল এক জোড়া বড় বুট জুতা। কোনো মহিলার পায়ে এই রকম বুট জুতা থাকার কোনো কারণ নেই। মেয়েদের পা এত বড় হয় না। হলেও মেয়েরা এই রকম পুরুষালি জুতা পরে না। আর যে প্যান্টটা দেখা গেল, সেটাও মেয়েরা পরে না।

মহিলা চলে গেলেন। আমি টুটুলের মুখের দিকে, টুটুল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মুখেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ব্যাপার কী?

ভদ্রমহিলাকে চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যে আসলে একজন পুরুষ, তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। এখন আমরা যদি তাকে চ্যালেঞ্জ করি, তিনি যদি কোনো অস্ত্রশস্ত্র বের করে ফেলেন। আমি রিনিখালার

কাছে গেলাম। বললাম, 'রিনিখালা, আপনার মোবাইল ফোনটা একটু নিই। একটা ফোন করতে হবে।'

রিনিখালা মোবাইলটা দিলেন। আমি ফোনটা নিয়ে ভদ্রলোক যেদিকে গেলেন সেদিকে যেতে লাগলাম।

একটা ঘরের সামনে গিয়ে দেখি বোরখাওয়ালা দরজার তালা খুলছেন। আমি যে এসে গেছি তিনি টের পাননি। আমি মোবাইলে তার পায়ের পেছনের জুতাজোড়ার ছবি তুলে ফেললাম। বোরখাওয়ালা ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি রুমটার নম্বরসহ দরজার ছবি তুললাম।

তারপর দ্রুত চলে এলাম রিসেপশনে।

বসে বসে টেলিভিশন দেখছি। হিন্দি সিনেমা হচ্ছে কী একটা। আমি হিন্দি বুঝি না। হিন্দি চ্যানেল দেখিও না। এরা কেন হিন্দি ছেড়ে রেখেছে, এরাই জানে।

টুটুল বলল, 'কী করলি?'

আমি বললাম, 'কাজ সেরে রেখেছি। টুটুল এই হিন্দি চ্যানেল কেন এরা এত দেখে বল তো।'

টুটুল বলল, 'কী জানি। বাসে তুই দেখবি সব সময় হিন্দি গান বাজে। কে শোনে এই সব? কোনো মানে হয় না। আজকাল কত সুন্দর বাংলা গান হচ্ছে।'

মামার গোসল শেষ হয়েছে। সদ্য কেনা কাপড়চোপড় পরে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। মামাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। একেবারে তরতাজা যাকে বলে।

মামা হোটেলের বিল পরিশোধ করলেন ভেজা টাকা দিয়ে। বেচারি, তার মানিব্যাগ মোবাইল ফোন সব ভিজে গেছে।

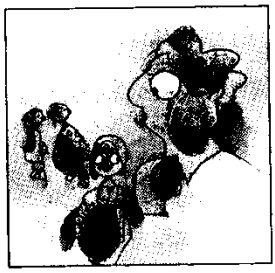

১০

আমরা আবার পথে নেমে গেছি। আবার একটা বাহন খুঁজছি। এবার আমরা আমাদের কলাবাগানের বাসায় ফিরে যাব। কিন্তু যথারীতি কোনো বাহনই আমাদের বহন করতে রাজি হচ্ছে না। আমরা হাঁটছি। সামনে একটা মাঠ। সেই মাঠ ধরে আমরা আবার একটু পথ-সংক্ষেপ করার জন্যে হাঁটছি। কোত্থেকে একটা কুকুর বলা নেই কওয়া নেই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো। মামা খুবই কুকুর ভয় পান। তিনিও ভয় পেয়ে দৌড় ধরলেন।

রিনিখালা বলতে লাগলেন, 'এই সুজন ভাইয়া, আপনি দৌড়াবেন না। কুকুর দেখে যে দৌড় ধরে কুকুর তাকেই তাড়া করে।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

মামা দৌড়াচ্ছেন প্রাণভয়ে। তিনি দৌড়াচ্ছেন আর মনে হচ্ছে মাঠ দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। কী তার শব্দ। পুরোটা মাঠ যেন তার পদক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কুকুরটাও নাছোড়। মামার পিছু পিছুই সে ছুটেই চলেছে।

মামা সামনে একটা গলির ভেতরে ঢুকে গেলেন। তার পিছনে কুকুরটা। আমরা আবার তার পেছনে।

গলিটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অন্ধ গলি। সেই গলির একদিকে একটা ছোট্ট ফোকর। দেয়াল ভেঙে এই ফোকর তৈরি হয়েছে। মামার আর পিছু ফেরার উপায় নেই। পেছনে ভয়ঙ্কর এক কুকুর।

মামা অগত্যা ওই ফোকর দিয়ে নিজের শরীরটা গলানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু লাভ হলো না। মাথাটা ঢুকল কোনোমতে। কাঁধটাও ঢুকে গেল। কিন্তু ভুঁড়িটা দিল বাগড়া। ঠিক ভুঁড়ির জায়গাটা গেল ভাঙা দেয়ালের

ফোকরে আটকে। মামার পা দুটো বেরিয়ে আছে। সেই পা দুটো কার্টুনের পায়ের মতো নড়ছে।

কুকুরটা গিয়ে মামার পায়ে একটা কামড় দিল। মামার সদ্য কেনা জুতা জোড়ার একটা খুলে গেল পা থেকে। সেই এক পাটি জুতা মুখে করে নিয়ে কুকুরটা দৌড়ে বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

আর আমাদের মোটকু মামা দেয়ালের ফোকরে ভীষণভাবে আটকেই রইলেন।

১১

আমরা ছুটে গেলাম মামার কাছে। এখন মামাকে বের করা দরকার। মামা চিকন গলায় বলছেন, 'ওরে আমাকে বের কররে।'

টুটুল বলল, 'মামা, মোটেও ভাববেন না। আপনাকে অবশ্যই বের করা হবে। এটা সিম্পল ম্যাথ। আপনি যে ফুটা দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন, সেই একই ফুটা দিয়ে আপনার শরীর অবশ্যই বের হবে। না বেরোনোর কোনোই সায়েন্টিফিক কজ নেই।'

রিনিখালা বললেন, 'এই আমাকে একটা বেবিট্যাক্সি-টুক্সি কিছু একটা ডেকে দাও, আমি বাসায় চলে যাব। কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম থেকে উঠেছিলাম।'

আমি বললাম, 'মামা-ভাগ্নে যেখানে আপদ নাই সেখানে। আমি আমার মামাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। না হয় হলোই আমার মামাটা একটু মোটকু।'

রিনিখালা এদিক ওদিক ফোন করতে লাগলেন।

আমি আর টুটুল মামার ঠ্যাং দুটো ধরে বের করবার নানা চেষ্টা করলাম। মামা শুধু ব্যথাই পেলেন। তাকে বের করা গেল না।

এরই মধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে।

কেউ বলল, আহা বেচারি। বড় চেঁচাচ্ছে। একটা ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন দিয়ে দিন।

কেউ বলল, কোন্ দোকানের চাল খায়।

কেউ বলল, সুইয়ের ফুটো দিয়ে কি হাতি ঢোকে?

কেউ বলল, এখন দুটো উপায় আছে। এক হলো দেয়ালটা ভাঙা। আরেকটা হলো, মোটকুটাকে শুকিয়ে ফেলা। কয়েকদিন না খাইয়ে রাখুন, এমনিতেই শুকিয়ে যাবে। তখন উনি আপনা-আপনিই বের হয়ে আসতে পারবেন।

প্রত্যেকটা কথায় যুক্তি আছে।

আমি রিনিখালার ফোন থেকে বাবাকে ফোন দিলাম। মার সঙ্গেও ফোনে কথা হলো। মা তো ফোনে কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'ওরে আমার আদরের ছোটভাইটাকে তোরা ফিরিয়ে দে।'

বাবা বললেন, 'তোরা খালি ঝামেলা বাধাস। এখন কী হবে?'

আমি বললাম, 'বাবা, বকা পরে দিও। লোকটা দেয়ালের ফাঁকে আটকে আছে, তাকে তো আগে বের করতে হবে। তাই না?'

বাবা বললেন, 'আচ্ছা দেখি আমি। দমকল বাহিনীতে আমার একজন বন্ধু আছে, বড় অফিসার। উনি পারেন কিনা উদ্ধার করতে।'

চারদিকে ভিড় জমে গেছে। পুলিশ এসে গেছে। তারা ব্যস্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণে। টেলিভিশনের ক্যামেরা এসে গেছে। তারা টেলিভিশনে লাইভ অনুষ্ঠান দেখাতে শুরু করেছে।

টেলিভিশনের ক্যামেরা দেখে রিনিখালা বললেন, 'ইস, কী যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। আমার আজকে একদমই ড্রেস ভালো না। তার ওপর সারাদিনের ধকল।'

টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা দেখা যাচ্ছে খুবই দক্ষ। তারা প্রথমে মামার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন:

'এখানে দেয়ালের ফাঁকে একজন বিপুলাকৃতির মানব সন্তান আটকে পড়েছেন। তিনি বড়ই অসহায়। দেয়ালের ফাঁকে পড়ে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আমরা এখন তার সাক্ষাৎকার নিব। ভাই, এই যে ভাই শুনছেন, আপনি যিনি দেয়ালের চিপায় আটকে আছেন, আপনার নাম কী?'

আমি পাশে যাই। আমি বলি, 'ওনার নাম সুজন আহমেদ।'

'আচ্ছা ওনার নাম সুজন আহমেদ। এইমাত্র একটা বাচ্চাছেলে এই তথ্য আমাদের দিল। তুমি জানলে কী করে ওনার নাম সুজন?'

আমি বলি, 'উনি আমার মামা। আমরা একসঙ্গে চারজন বের হয়েছিলাম। আমি, আমার বন্ধু টুটুল, টুটুলের রিনিখালা আর আমার এই মোটকু মামা।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তুমি কি এনাকে মোটকু মামা বলে ডাকো।'

'জি।'

'আচ্ছা আচ্ছা। তুমি কি বলতে পারবে উনি কীভাবে এই দেয়ালের ফোকরে আটকে গেলেন?'

'পারব। তবে বলব না।'

'কেন বলবে না কেন?'

'আগে আপনারা ওনাকে উদ্ধার করেন।'

'আমরা তো বাবু ওনাকে উদ্ধার করব না। ওনাকে উদ্ধার করবে পুলিশ, দমকল বাহিনী, সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারী দল। আমরা শুধু ওনার খবর সারাদেশের মানুষকে জানাব।

আচ্ছা বলো উনি কীভাবে আটকে পড়লেন।'

টুটুল এগিয়ে এলো। টুটুল বলল, 'উনি আটকে গেছেন কপালের দোষে। এই দুনিয়াটা একটা ফাঁদ। কে কখন ধরা পড়বে আমরা কেউ জানি না।'

'চমৎকার বলেছে এই শিশুটি।' টেলিভিশনের প্রতিবেদক উচ্ছ্বসিত। তিনি বলে চলেছেন, 'আর ওই দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুজন আহমেদের প্রেমিকা তিনি খুবই বিষণ্ন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, সুজন আহমেদ তার প্রেমিকাকে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌ-ভ্রমণে এসেছিলেন। দুজনেই তাদের নিজ নিজ ভাগ্নেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। কিন্তু কী এক দৈব দুর্ঘটনায় এই সুজন আহমেদ এই দেয়ালের ফোকরে

আটকে গেছেন। আমরা এখন সুজন আহমেদের প্রেমিকার সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করব।'

পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে পুরো জায়গাটা। মানুষের ভিড় সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আমরা কয়েকজন। আমাদের মর্যাদা বেড়ে গেছে, কারণ আমরা মোটকু মামার সঙ্গী-সাথী। টিভি ক্যামেরার লক্ষ্য এখন রিনিখালা। তিনি পরে আছেন একটা ফতুয়া আর জিনসের প্যান্ট। গলায় একটা ওড়না ছিল, তিনি সেটা তাড়াতাড়ি মাথার ওপরে টেনে দিয়ে মুখ ঢাকলেন।

'আচ্ছা, রিনি, আপনি বলুন, আপনার বন্ধু যে এইভাবে আটকা পড়ল, এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?'

রিনিখালা তার ওড়নার ঘোমটা আরও টেনে দিলেন।

'আচ্ছা উনি তার বন্ধুর এই বিপদে এতই মুষড়ে পড়েছেন যে উনি মুখ খুলছেন না।' টেলিভিশনের প্রতিবেদক আবার মোটকু মামার সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করছেন। 'ভাই, ভাই সুজন আহমেদ। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?'

মামা তার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন কিনা, উপস্থিত জনতার অবিরাম কথার তোড়ে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

'আচ্ছা আপনি যদি আমার কথা শুনতে পান, তাহলে পা নাড়ুন।'

মামা পা নাড়েন।

'উনি শুনতে পাচ্ছেন।' টিভি প্রতিবেদক বললেন, 'আচ্ছা আপনি যে এইভাবে দেয়ালের ফুটোয় আটকে পড়লেন, এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?'

মামা একটা পা পেছন দিকে ছুড়ে মারলেন। তার এক পায়ে জুতা, আরেক পা খালি।

এর দ্বারা মামা কী বোঝাতে চাইলেন তিনিই জানেন।

প্রতিবেদক বললেন, 'সুজন আহমেদ সাহেব তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এক পা জোরে ছুড়ে মেরে। এর দ্বারা তিনি কী বোঝাচ্ছেন, আমরা জানি না। তবে এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এখানে উপস্থিত হয়েছেন। ইনি আবার আমাদের টেলিভিশনে নিয়মিত টক-শো করে থাকেন। জনাব ফজলু গজনবী। ফজুল গজনবী সাহেব আপনাকে এইখানে পাওয়ায় আমরা ধন্য।'

গজনবী সাহেব পরে আছেন লম্বা পাঞ্জাবি। তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ।'

'আপনি জানেন এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা আমরা লাইভ কভার করছি।' প্রতিবেদক বলে চলেছেন।

'জি জানি।'

'তো আমরা এতক্ষণ এই সুজন আহমেদ সাহেবের প্রতিক্রিয়া নিচ্ছিলাম। উনি ওনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এক পা পেছন দিকে ছুড়ে মেরেছেন। এর দ্বারা উনি কী বলতে চাচ্ছেন বলে আপনার মনে হয়?'

গজনবী সাহেব কেশে গলা পরিষ্কার করে বলতে লাগলেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ। সুন্দর প্রশ্ন। আসলে এক পা ছুড়ে মেরে তিনি অনেক কিছুই প্রকাশ করতে পারেন। যেমন, নীল আর্মস্ট্রং যেদিন চাঁদের বুকে প্রথম পা রাখল, তখন কী ঘটল– এ স্মল স্টেপ ফর এ ম্যান, এ জায়ান্ট স্টেপ ফর ম্যানকাইন্ড। এক পা দিয়ে তিনি আমাদের সভ্যতার জন্যে একটা বড় পদক্ষেপ রচনা করলেন। তিনি জানাতে চাইলেন, আসলে মানুষ মূলত একা। একাই এসেছি ভবে, একাই যেতে হবে।'

এর মধ্যে প্রতিবেদকের পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। তিনি ফোনটা রিসিভ করলেন। 'আচ্ছা, আচ্ছা' বললেন। তারপর মাইকে বলতে লাগলেন, 'এই মাত্র আমাদের স্টুডিও থেকে রুপা ফোন করেছিল। দর্শকরা টেলিভিশনে সরাসরি ফোন করে জানতে চাচ্ছেন, একটা লোক দেয়ালের ফোকরে আটকে পড়ে আছে, তাকে উদ্ধার করা হচ্ছে না কেন?'

'আমি এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করছি', প্রতিবেদক ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে গেলেন এক পুলিশ কর্তার দিকে। এই প্রশ্নটা আমারও মনের কথা। মামাকে উদ্ধার করা হচ্ছে না কেন। দেয়ালটা ভেঙে এতক্ষণে মামাকে কি বের করে আনা উচিত ছিল না এদের?

পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, 'আসলে আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না, কারণ এই দেয়ালটা একটা বিতর্কিত দেয়াল। এটা মামলাধীন। আদালতের নির্দেশ আছে এটাকে স্থিত-অবস্থায় রাখতে হবে। কেউ এই দেয়াল ভাঙতে পারবে না, যতদিন না বিচার শেষ হয়, একটা রায় পাওয়া যায়। এখন এই অবস্থায় দেয়াল ভাঙা হলে আদালতের আদেশ অমান্য করার অপরাধ হয় কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।'

শুনে আমি ভ্যা করে কেঁদে দিলাম।

আমি বাবাকে ফোন করলাম। বললাম ঘটনা। বাবা বললেন, 'আমরা শুনেছি ঘটনা। দমকলের বড় কর্তা সব বলেছেন আমাকে। আমরা এখন চেষ্টা করছি আদালতের অনুমতি নেওয়ার। খুব বড় উকিল ধরা হয়েছে। এখন এই সন্ধ্যা বেলাতেই স্পেশাল আদালত বসিয়ে স্পেশাল পারমিশন নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

১২

আমার খুব কান্না পাচ্ছে। আমরা বাসায় চলে এসেছি। আমি টেলিভিশনের সামনে বসে সরাসরি সম্প্রচার দেখছি। আমার মামার পা দুটো দেখা যাচ্ছে। তার এক পায়ে জুতা, আরেক পা খালি। এই দৃশ্য দেখিয়ে টিভিওয়ালারা গানও ছেড়ে দিল:

এক পায়ে নূপুর তোমার

অন্য পা খালি

একপাশে সাগর তোমার এক পাশে বালি

আমার ছোটতরী বলো যাবে কি?

কোনো মানে হয়? মামাকে আগে এরা বের করবে না? মামার পাশে বসে মামাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ছোটখালা। তার পাশে তাদের ড্রাইভার মজিদকেও দেখা যাচ্ছে। বাবা এখনও বাসায় আসেননি। তিনি সম্ভবত উচ্চ আদালত থেকে অনুমতি নিয়েই ছাড়বেন।

গভীর রাতে খবর পাওয়া গেল, আদালতের অনুমতি পাওয়া গেছে।

বাবা বললেন, অনুমতি যাতে না পাওয়া যায়, সে জন্যে নাকি একটা পক্ষ খুবই চেষ্টা করেছিল। কেন?

কেন এই অনুমতি আটকে রাখার চেষ্টা করেছিল কেউ কেউ, সেটা জানা গেল গভীর রাতে।

একেই হয়তো বলা যায়, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে সাপ।

মধ্যরাতে আমরা টেলিভিশনের সামনে বসে আছি। মামার দেয়ালটা ভাঙা হচ্ছে সেটা দেখছি। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলী কোর এই দেয়াল

ভাঙার কাজটা করছে। তারা ক্রেন নিয়ে প্রথমে দেয়ালের অন্য পাড়ে গেল।

তারপর তারা দেয়াল ভাঙছে। খুব সাবধানে দেয়ালটা ভাঙতে হচ্ছে। যাতে মামা আঘাত না পান। সেটা করতে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগল। দেয়ালের ইট সরিয়ে ফুটোটা বড় করা হলো। তারপর মামার পা ধরে টেনে মামাকে বের করা হলো।

মামা মাটিতে পা রেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অজ্ঞান হওয়ার আগে তিনি বললেন, 'স্মাগলার।'

টেলিভিশনের সাংবাদিক আর পুলিশ মামাকে জিজ্ঞেস করল, 'স্মাগলার। কোথায়?'

'ভেতরে।' মামা দেখিয়ে দিলেন।

জ্ঞান হারানোর আগে এটাই ছিল মামার শেষ কথা।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনের প্রতিবেদক বলতে লাগলেন, এই দেয়ালের ওই পারে চোরকারবারিদের একটা গোপন কুঠুরি আছে। দেয়ালের ওই পার থেকে ক্রেনে চড়ে যারা আসছেন, তারাও ব্যাপারটাকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। শোনা যাচ্ছে, ভেতরে একটা চোরকুঠুরি আছে মাটির নিচে। সেই চোরকুঠুরির ভেতরে কী আছে, সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব। পুলিশ ও র‍্যাব পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলেছে।

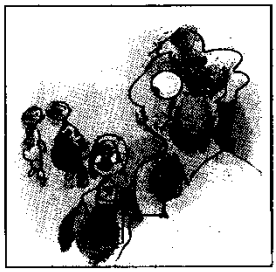

১৩

রাত বাজে একটা। ঘুমে আমি চোখ সোজা করে রাখতে পারছি না। কাল সারাটা দিন কম ধকল তো যায়নি আমাদের ওপর দিয়ে। কিন্তু তবু আমি ঘুমাব না। কারণ আমার মনে অন্য আরেকটা উত্তেজনা কাজ করছে।

আমার মন যেন ডেকে বলছে, দুপুরবেলা হোটেলের রিসেপশনে যে জুতার ছবি তুলেছি, তার সঙ্গে এই চোরকুঠুরির কোনো সম্পর্ক আছে।

মামাকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মামার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তবু তাকে ডাক্তাররা অবজারভেশনে রেখেছেন। আর মামাকে কুকুর কামড়ানোর ইনজেকশন দেয়া হয়েছে।

আমি টেলিভিশনে লাইভ চোরকুঠুরি অভিযান দেখছি।

পুলিশ একটা ম্যানহোলের ঢাকনা খুলল। তার ভেতরে আলো ফেলল। ভেতরে দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি। প্রতিবেদক ধারাবর্ণনা দিচ্ছেন, 'ম্যানহোলের ঢাকনার নিচে সিঁড়ি। এটা কখনও দেখা যায় না।'

পুলিশ বড় বড় সার্চ লাইট জ্বালিয়েছে।

প্রতিবেদক বললেন, 'বড় বড় গোয়েন্দারা এক জোড়া বুটের ছাপ পেয়েছেন। সেই ছাপটার ছবি তারা তুলছেন। এখন এই জুতাওয়ালাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

আমার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। এই জুতাওয়ালা সেই জুতাওয়ালা নয় তো? এত রাতে আমি এখন কী করি?

প্রতিবেদক পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। পুলিশ কর্তা বলছেন, 'এই কুঠুরিতে কতগুলো খুবই দামি ও বিরল পুরাকীর্তি ও মূর্তি আছে। কিছুদিন আগে এগুলো জাদুঘর থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা

মূর্তিগুলোকে উদ্ধার করতে পারছি, কিন্তু এর নেপথ্যে কারা আছে, সেটা এখনই বলা যাবে না।'

আমাকে এখনই মুখ খুলতে হবে। আমি একটা ছোট্ট ছেলে, আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি, কিন্তু আমি দেশের জন্যে একটা খুব বড় কাজ করতে পারি।

আমি ঘর ছাড়লাম কাউকে কিছু না বলে। প্রথমে গেলাম টুটুলদের বাসায়।

বেল টিপলাম। টুটুলরাও জেগে ছিল। রিনিখালার গলা শোনা গেল, 'কে?'

আমি বললাম, 'রিনিখালা, আমি অয়ন।'

রিনিখালা দরজা খুলে বললেন, 'সারাটা দিন যন্ত্রণা করলি। আবার রাতেও যন্ত্রণা করতে এসেছিস। ব্যাপার কী?'

আমি বললাম, 'আছে ব্যাপার। তোমার মোবাইল ফোনটা দাও। লাগবে।'

রিনিখালা বললেন, 'এতরাতে আমার মোবাইল ফোন নিয়ে তোকে টানাটানি করতে হবে কেন?'

'করতে হবে। কারণ আছে।'

টুটুলও দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বলল,'কী রে অয়ন?'

আমি বললাম, 'টুটুল, হোটেলে এই মোবাইলে যে ছবিটা তুলেছিলাম এইটা এখন লাগবে। এই রাতেই।'

টুটুল বলল, 'কেন, কী করবি?'

আমি বললাম, 'আমরা একটা বড় গ্যাং ধরতে পারব। যদি আজ রাতেই পুলিশ অভিযান চালায়। তা না হলে ওরা সকাল হওয়ার আগেই পালিয়ে যাবে।'

রিনিখালা বললেন, 'তোমরা কী বলছ আমি বোধ হয় বুঝতে পারছি।'

অয়নের বাবার গলা শোনা গেল, 'এই তোমরা এত রাতে আবার কী করছ?'

আমি বললাম, 'আংকেল। খুব জরুরি দরকার। আপনার সঙ্গে পুলিশের কারও পরিচয় আছে? খুব বড় কাউকে লাগবে।'

আংকেল বললেন, 'আমার সঙ্গে তো পুলিশের কারো তেমন পরিচয় নাই। তবে র‍্যাবের প্রধানের সঙ্গে পরিচয় আছে। উনি আমার সঙ্গে একই কলেজে পড়তেন।'

'আপনার কাছে তার মোবাইল নম্বর আছে?'

'আছে। কিন্তু এত রাতে কেন?' টুটুলের বাবা বললেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি টিভিতে চোরকুঠুরি অভিযানটা দেখেছেন?'

আংকেল বললেন, 'হ্যাঁ।'

'একজোড়া জুতার ছাপ দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি তাকে রিনি খালার মোবাইল থেকে ফটো বের করে দেখালাম। 'আমার মনে হয় এই সেই জুতা। আর এরা থাকে এই হোটেলের এই রুমে।'

আংকেল বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। আমি এক্ষুণি ফোন করছি।'

১৪

আমি টুটুলদের বৈঠকখানায়। টুটুলের বাবা ফোন করলেন তার বন্ধু র‍্যাব প্রধানকে। ফোন করতে করতে বলছিলেন, 'লোক তো খুবই ভালো, কিন্তু এতদিন পরে আমাকে চিনবে কিনা। একবার ওই তো মোবাইল নাম্বার দিয়েছিল। আমারটাও নিয়েছিল। রিং হচ্ছে। দেখা যাক ধরে কিনা।'

'হ্যালো, এই আমি সুলতান, কলেজের বন্ধু সুলতান, রোল নম্বর ১১। চিনেছিস। হ্যাঁ শোন ঘুমিয়ে পড়েছিলি। আমরাও টিভিতে ওই লাইভ অপারেশনটাই দেখছি। শোন ফোন করলাম খুব জরুরি একটা খবর দেওয়ার জন্যে। আর যা করার সেটা করতে হবে এখনই। ওই চোরকুঠুরিতে যে জুতার ছাপটা দেখালি তোরা ওই জুতাজোড়া কার হতে পারে, আর সে কোথায় আছে, সেই তথ্য আমার কাছে আছে। তুই এক্ষুণি আমার বাসায় ফোর্স পাঠা। আমার বাসার ঠিকানাটা লিখে নে। ধর। বলছি, বাড়ি ২৪, রোড ...'

পনেরো মিনিটের মধ্যে র‍্যাবের একটা গাড়ি এসে আমাদের বিল্ডিঙের সামনে থামল। আমি, টুটুল, রিনিখালা, আংকেল সবাই র‍্যাবের গাড়িতে উঠে পড়লাম।

এর মধ্যে র‍্যাবের কর্মকর্তাকে আমি মোবাইল ফোনে তোলা ছবিগুলো দেখালাম। উনি বললেন, 'হুঁ। কোন হোটেল?'

আমরা বললাম, 'হোটেলটার নাম অভিলাষ হোটেল। কিন্তু ঠিকানা তো জানি না।'

রিনিখালা বললেন, 'সুজন ভাইয়া ঠিকানা জানেন। ওনার পকেটে হোটেলের বিল আছে।'

কর্মকর্তা বললেন, 'সুজন সাহেব মানে যিনি আটকা পড়েছিলেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। দি গ্রেট সুজন আহমেদ। ওরফে মোটকু মামা।'

কর্মকর্তা ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন হাসপাতালে যেতে। সেখানে গিয়ে আমরা সোজা আলমারিতে ঝোলানো মোটকু মামার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে হোটেল বিলের কপি বের করে ফেললাম। র‍্যাব কর্তা বিলটা নিলেন। বললেন, 'মোবাইলটা দেবেন?'

আমি বললাম, 'না মোবাইল দরকার নেই। আপনি শুধু রুম নাম্বারটা লিখে নেন।'

অফিসার রুম নাম্বারটা লিখে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারলেস বের করে বললেন, 'অভিলাষ হোটেল, ২৭-বি....রুম নম্বর ২০৩। অন্য রুমেও সার্চ করো। সবাইকে আটক করো। জুতা জোড়া পাবে ২০৩-এ। আমি আসছি।'

ওনারা চলে গেলেন। আংকেল বললেন, 'আরে আমাদেরকে এখানে রেখে ওরা চলে গেলেন। আমরা বাসায় যাব কীভাবে।'

টুটুল বলল, 'বাবা, আজকে আর না হয় বাসায় নাই গেলাম। আসো, এই হসপিটালের কেবিনে বসে টিভিতে বাকি ঘটনা দেখতে থাকি।'

১৫

হাসপাতালের এই কেবিনটা বড়সড়। মা আগে থেকেই মামার সঙ্গে থাকার জন্যে চলে এসেছিলেন। মামার বেডের পাশে আরেকটা বিছানায় মা থাকবেন–এমনি কথা ছিল। কিন্তু এখন আমরা সবাই মিলে দুই বিছানা আর চেয়ার আর সোফা দখল করে বসলাম। টেলিভিশন অন করা।

হোটেল অভিলাষ অভিযানও সরাসরি দেখানো হচ্ছে। পুলিশ র‍্যাব পুরো হোটেল ঘিরে ফেলল। তারা দ্রুত ওই রুমটায় চলে গেল। দরজা ধাক্কা দিচ্ছে পুলিশ। কিন্তু ওরা খুলছে না। তার বদলে এলো গুলির শব্দ।

টেলিভিশনের ক্যামেরা অফ হয়ে গেল।

টিভির ঘোষক বললেন, 'আমাদের প্রচারে একটু বিঘ্ন ঘটেছে। লাইন পাওয়া গেলে আমরা আবার আপনাদের অভিলাষ হোটেলে নিয়ে যাব। এখন দেখুন আগের ফুটেজ।' চোরকুঠুরিতে কী কী পাওয়া গেছে।

চোরকুঠুরিতে পাওয়া গেছে অনেকগুলো পুরাকীর্তি। এর মধ্যে ১৫০০ সালের পুরোনো বৌদ্ধমূর্তিও আছে।

আবার লাইভ প্রচারে গেল টেলিভিশনওয়ালারা। আমরা দেখলাম, একে একে কতিপয় লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এদের মধ্যে একজন খুবই কুখ্যাত চোরাকারবারি আয়নাল পরামানিককে ধরা হলো ২০৩ নম্বর থেকে। পুলিশ বলল, তার পায়ের বুট জোড়ার ছাপই পাওয়া গেছে চোর কুঠুরিতে।

যাক। অপরাধীরা ধরা পড়েছে।

'এই সবাই ঘুম দাও।' আংকেল বললেন।

এই একটা ঘরে এতজন কী করে ঘুমাব। একটু পরে র‍্যাবের গাড়ি আবার এলো। বলল, 'স্যরি আপনাদের তো বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়নি।'

টুটুলের বাবা আর রিনিখালা ফিরে গেলেন। আমি, টুটুল আর মা রয়ে গেলাম হাসপাতালের কেবিনে।

আমি, টুটুল আর মা এক বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করছি।

আর একটা বিছানায় মোটকু মামার একটা শরীর কোনোমতে আটানো গেল। একটু পরে মামার দুই নাক দিয়ে শিংগা ফোকার আওয়াজ হতে লাগল।

১৬

বাবা বললেন, 'খবরদার, কেউ যেন ঘূণাক্ষরেও না জানে যে অয়ন তুই ওই কুখ্যাত স্মাগলার আয়নাল পরামানিকের ফটো তুলেছিলি।'

আমি বললাম, 'মাথা খারাপ বাবা।'

টুটুলের বাবাও র‍্যাবের আংকেলকে বলে দিলেন যাতে আমাদের কথা একদমই গোপন রাখা হয়।

আংকেল আমাদের ব্যাপারটা গোপন রাখার বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন।

কিন্তু মোটকু মামার গোয়েন্দাখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারাদেশে। কারণ তিনি বললেন, 'আমিই তো প্রথম ওই স্মাগলারদের স্মাগলার বলে সনাক্ত করতে পেরেছিলাম।'

১৭

রিনিখালার সঙ্গে মোটকু মামার খাতিরটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেল।

রিনিখালা বললেন, 'আমি সুজনকে বিয়ে করতে চাই। শুধু আমার একটাই শর্ত। ওকে একটু ওজন কমাতে হবে।'

মামা বললেন, 'আরে আমার ওজনই তো আমার প্রতিভা। আমি যে মোটা সেই কারণেই তো আমি বিখ্যাত। আমি চিকন হলে ওই দেয়ালের ফুটোতেও আমি আটকাই না। আর এত হৈচৈও হয় না। আমাদের দামি মূর্তিগুলো উদ্ধারও হয় না।'

রিনিখালা বললেন, 'তবুও আমি চাই তুমি স্লিম হও। তিনি ডাক্তারি বই বের করে বললেন, পৃথিবীতে মানুষের বহু অসুখের মূলে হচ্ছে ওজন বেশি হওয়া। ব্লাড প্রেসার, হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, বাত, ব্যথা– কত কিছু হয় এই মোটাত্ব থেকে। তোমাকে অবশ্যই ওজন কমাতে হবে।'

'কীভাবে?'

রিনিখালা বললেন, 'আমার সঙ্গে তুমি রোজ দৌড়াবে। তাতে আমার খিদেও একটু বাড়বে। আমার খাওয়া বাড়বে। আমি একটু ওজন বাড়াব। আর তুমি তোমার ফ্যাট ঝরাবে। কন্ট্রোলড ডায়েট করবে। আদনান সামির মতো মোটা লোক যদি এতটা শুকিয়ে যেতে পারে, তুমি কেন পারবে না?'

আমরা দুইজন, টুটুল আর আমি বলি, 'মামা, নিশ্চয়ই পারবে। কেন পারবে না?'

দার্শনিক টুটুল বলে, 'মামা, মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। অসম্ভব কথাটা কেবল বোকাদের ডিকশনারিতে থাকে।'

এরপর থেকে ওরা দুইজন খুব ভোরবেলা উঠে ধানমণ্ডির লেকের ধারে নিয়মিত দৌড়াতে শুরু করেন।

মোটকু মামার কারণেই নাকি ধানমণ্ডি লেকের ধারের পাকা পায়ে চলার পথটা নড়বড়ে হয়ে যায়। এত ওজনের কেউ দৌড়াবে, প্রকৌশলীদের হিসাবে নাকি সেটা ছিল না।

সত্যি সত্যি মামার ওজন কমে যেতে লাগল। মামাকে এখন আর মোটকু মামা বলাই যাবে না। আর রিনিখালা আর মামাকে কেউ আর ঢাকের কাঠি আর ঢাক বলতেও পারবে না।

১৮

এর মধ্যে একদিন রিনি খালা কাঁদতে শুরু করলেন। টুটুল আমাকে বলল, 'অয়ন, চলে আয় তো বাসায়। রিনিখালা কাঁদছেন কেন। আয়।'

আমি গেলাম টুটুলদের ফ্লাটে।

সত্যি সত্যি রিনিখালা কেঁদে কেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন।

'কী হয়েছে রিনিখালা?' আমি বললাম।

'না কিছু হয়নি।' খালা চোখ মুছতে মুছতে বললেন।

'অবশ্যই কিছু হয়েছে। কী হয়েছে বলো।' আমি বললাম।

রিনিখালা বললেন, 'তোমরা তো অনেক বড় গোয়েন্দা। সুজন আর কী গোয়েন্দা। আসল কাজ তো করেছ তোমরা। ওই স্মাগলার সর্দারটার ছবি তুলে।'

'তো হঠাৎ এই কথা কেন?' আমি বললাম।

'অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'– টুটুল বলল।

রিনিখালা বললেন, 'তোমাদেরকে আরেকটা রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে?'

'কী সেটা?' আমি আর টুটুল একযোগে বলে উঠলাম।

রিনিখালা বললেন, 'কাউকে বোলো না। তোমাদের মোটকু মামার নাকি একটা মেয়ে আছে।'

'মানে?' আমি চোখ সরু করে বললাম।

'মানে হি হ্যাজ গট আ ডটার। সে একটা কন্যা-সন্তানের পিতা।'

আমি বললাম, 'কই আমি শুনি নাই তো কখনো কিছু।'

রিনিখালা আরেক পশলা কেঁদে নিয়ে বললেন, 'আমিই কি আগে থেকে কিছু শুনেছি নাকি? এই প্রথম শুনলাম।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা তোমার এই কেসটা আমরা নিচ্ছি। আমরা অবশ্যই এই কন্যা-রহস্য উদঘাটন করে দেব। কিন্তু তোমারও তো সহযোগিতা লাগবে। তুমি বলো, তুমি কার কাছ থেকে জানলে যে ওর মেয়ে আছে?'

'ওর মোবাইলে একটা এসএমএস এসেছে। আমি হঠাৎই এসএমএসটা দেখে ফেলেছি। তাতে লেখা, আপনার ডটার বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। এ উপলক্ষে আমরা একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান করেছি। আপনাকে আসতে হবে।

তারপর ও আবার ফোন করল। বলল, তাই নাকি আমার মেয়ের রেজাল্ট এত ভালো নাকি। বেশ তো। নিশ্চয়ই যাব। কবে করছেন অনুষ্ঠান। ও একটু উঠে গিয়ে দূরে এই আলাপ করছে। ও তো আর বুঝতে পারছে না যে আমি ওর সব কথা ফলো করছি। ব্যস ধরা খেয়ে গেছে।' রিনিখালা কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন।

আমি বললাম, 'আশ্চর্য তো। এও কি সম্ভব?'

টুটুল বলল, 'অসম্ভব কথাটা কেবল বোকাদের ডিকশনারিতে থাকে।'

আমাদেরকে আবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট হাতে নিতে হলো। অপারেশন: মোটকু মামার মেয়ে-রহস্য।

১৯

মোটকু মামাকে আর মোটকু বলা যাবে না। কিন্তু মোটকু তো তার শারীরিক পরিচয় নয়। এটা তার নাম। তিনি হালকা পাতলা হলেও মোটকু মামা, মোটাসোটা হলেও মোটকু মামা। যাই হোক, মোটকু মামার যে আগে বিয়ে হয়েছিল, একটা মেয়েও আছে, এই রহস্যের কোনো কিনারা এখনও করতে পারিনি। যতদূর তদন্ত করে দেখেছি, ঘটনা সত্যিই সন্দেহজনক। তার মোবাইলে সত্যি সত্যি মেয়ের খবর আসে। মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায়, তার মানে আমার সমবয়সী সেই মেয়েটা। বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মামা যাচ্ছেন।

আমি বললাম, মামা কই যাও?

মামা বলেন, আছে এক জায়গায়।

'এক জায়গা তো বুঝলাম। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?'

'তোকে বলা যাবে না।'

'আচ্ছা কোথায় যাচ্ছ বলা না যাক, কেন যাচ্ছ সেটা তো বলে যাবে।'

'না, সেটাও বলা যাবে না।'

'আচ্ছা আমাকে না হয় না বললে, রিনিখালাকে তো বলে যাবে।'

'না, রিনিকেও বলা যাবে না।'

'ব্যাপারটা তো মামা বেশ রহস্যজনক।'

'কথা কম।'

যাক মামা বেরিয়ে পড়লেন। আর আমরাও মামাকে দূর থেকে ফলো করতে লাগলাম।

মামা একটা সিএনজি স্কুটার ভাড়া করলেন। এখন তিনি অনেকটাই হালকা-পাতলা, ফলে সহজেই তিনি বাহন পেয়ে যান।

আমাদের গাড়ি (মজিদ আংকেল এর চালক) আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমরা গাড়ি করে তার স্কুটার অনুসরণ করতে লাগলাম।

শেষে স্কুটার ঢুকল একটা এতিমখানায়। এটা একটা আন্তর্জাতিক এনজিও পরিচালিত এতিমখানা। আমরা এতিমখানার গেটের বাইরে গাড়ি দাঁড় করালাম।

আমি গাড়ি থেকে নেমে কিছুদূর এগিয়ে গেলাম।

গেটে দারোয়ান আছে। ভেতরে আজ আর ঢোকা হলো না।

আমরা মজিদ আংকেলের গাড়ি করে বাসায় ফিরে এলাম। রিনিখালার মুখটা হয়ে রইল আষাঢ়ের আকাশের মতো। গম্ভীর আর মেঘে ঢাকা।

রিনিখালা ঘোষণা করলেন, তিনি আর মোটকুমামাকে বিয়ে করছেন না।

২০

পরের দিন, আমি রিনিখালা আর টুটুল আবার গেলাম ওই শিশু সদনটিতে।

রিনিখালা বললেন, 'আমরা এখানে কিছু সাহায্য করতে চাই। সে ব্যাপারে জানতে এসেছি।'

দারোয়ান আমাদেরকে অফিসে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল।

অফিসে ঢুকলাম আমরা। একজন বাঙালি মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা বসে আছেন সাদাশাড়ি পরে। তার চোখে চশমা।

রিনিখালা বললেন, 'এটা তো একটা শিশুসদন। তাই না?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'জি।'

রিনিখালা বললেন, 'আমি আসলে আপনাদের হেল্প করতে চাই। তাই জানতে এসেছি।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আচ্ছা বলেন কী জানতে চান?'

রিনিখালা বললেন, 'এইখানে কারা থাকে?'

'একদম বাবা নেই, মা নেই, অনাথ, এই রকম ছেলেমেয়েদের পথ থেকে উদ্ধার করে এনে এখানে রাখা হয়।'

'বাবা আছে। মা নেই। বা বাবা মার ডিভোর্স হয়ে গেছে। এই রকম বাচ্চাও কি রাখেন?'

'না। যাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই সাধারণত সেই রকম বাচ্চা এখানে রাখা হয়।'

'না মানে আমার এক পরিচিত সুজন আহমেদ উনি ওনার মেয়েকে এখানে রেখেছেন।'

'ও সুজন আহমেদ। ওনার মেয়ে মানে ব্যাপারটা বলছি। আমাদের বাচ্চাগুলোর তো এই পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। তো আমরা চাই, আপনাদের মতো লোকেরা, ভদ্রমহিলারা ওদের দায়িত্ব নেন। আমাদের দেশে দত্তক আইন নেই। আপনি ইচ্ছা করলেই একটা বাচ্চা দত্তক নিতে পারবেন না। আমরা করি কী, একেকটা বাচ্চার দায়িত্ব একেকটা ফ্যামিলিকে দিয়ে দেই। সুজন সাহেব ক্লাস সিক্সের একটা মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি ওর লেখাপড়ার খরচ দেন।'

'তার মানে মেয়েটি ওর নিজের মেয়ে নয়?'

'না। তবে নিজেরও বেশি। অনেক ভালোবাসেন উনি ওই বাচ্চাটিকে।'

'আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি।'

আমাদের তিনজনের মুখেই হাসি ফুটে ওঠে।

২১

রিনিখালার সঙ্গে মোটকু মামার বিয়েতে আর কোনো বাধাই রইল না।

বিয়ের সময় বরকর্তা হলাম আমি।

আর কনে-কর্তা হলো টুটুল।

বিয়ে হলোও খুব ধুমধাম করে।

বিয়ের পরে রিনিখালা মোটা হতে লাগলেন। আর মামা শুকিয়ে যেতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দুজনকে 81-এর মতো না আবার দেখাতে শুরু করে, আমাদের এখন এই চিন্তা। এর মধ্যে এইট হতে যাচ্ছেন রিনিখালা আর ওয়ান হতে যাচ্ছেন মোটকু মামা। এই কথা রিনিখালাকে বললেই তিনি শুধু হাসেন। এই মহিলার সত্যিই হাসিরোগ আছে।

২২

মামা এখন আলাদা বাসা নিয়েছেন। রিনিখালা (মামি) আর তিনি সেই বাসায় সুখে সংসার করছেন।

একদিন ঈদের ছুটিতে মোটকু মামা, রিনিখালা (মামি), টুটুল আর আমি গেলাম ওই শিশু সদনটিতে। গিয়ে দেখি ছেলেমেয়ে সব বিকালবেলা বসে টেলিভিশন দেখছে। আমরা ঈদের ছুটি কাটাই বাবা-মার সঙ্গে, আর এই বাচ্চাদের জগতে আপন বলতে কেউ নেই। বাবা নেই, মা নেই। তারা এই শিশু সদনেই থাকে। ঈদের ছুটিতেও কেউ তাদের নিতে আসে না।

আমি বললাম, 'মামা, চলো, ফুলিকে আমরা বাসায় নিয়ে যাই। তোমার বাসায়, না হয় আমাদের বাসায়। বেড়াতে গেলে ওর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।'

ফুলি মামার মেয়ের নাম। ও ক্লাস সিক্সেই পড়ে। ভালো ছাত্রী। বৃত্তি পেয়েছে। ফুলি দেখতে ফুলের মতোই সুন্দর। শুধু একটু রোগা। বোঝাই যায়, এখানকার খাওয়া-দাওয়া খুব ভালো নয়।

মামা বললেন, 'ফুলি, তোকে তো অয়ন আজকে বাসায় নিতে চাচ্ছে।'

ফুলি বলল, 'না বাবা, আজকে যাব না। তোমরা আমাকে দেখতে এসেছ, আমি তাতেই খুশি। কিন্তু অন্য ছেলে-মেয়েদের দেখো, ওদেরকে তো কেউ দেখতেও আসে না। ওদেরকে ফেলে রেখে যদি যাই, ওরা খুব মন খারাপ করবে।'

ফুলিকে রেখেই আমরা চলে এলাম।

ওই ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে আমার খুব মন খারাপ লাগছে। ইস, আমার সমান, আমার চেয়ে ছোট এই ছেলেমেয়েগুলোর বাবা নেই, মা নেই, মামা নেই, মামি নেই। কে আছে তাহলে ওদের?

বাথরুমে ঢুকে ওদের কথা ভেবে আমি কাঁদতে লাগলাম। হু হু করে কান্না। মনে মনে বললাম, এই ছেলেমেয়েরা যেন ভালো থাকে, অনেক ভালো।

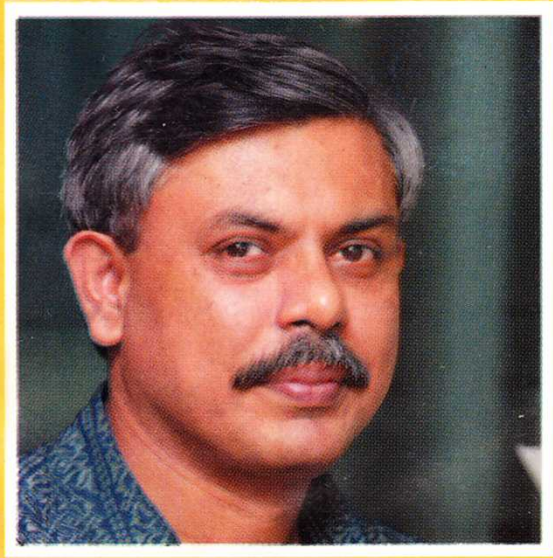

আনিসুল হকের জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, রংপুরের নীলফামারীতে। পিতা মরহুম মো: মোফাজ্জল হক, মাতা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। জন্মের পরেই পিতার কর্মসূত্রে তারা চলে আসেন রংপুরে। রংপুর পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রংপুর জেলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁকে পড়েন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রকৌশলী হিসেবে একবার যোগ দিয়েছিলেন সরকারী চাকরিতে, কিন্তু ১৫ দিনের মাথায় আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতা তথা লেখালেখিতেই। বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকে উপসম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তাঁর বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা. কলাম, টেলিভিশনের জন্যে চিত্রনাট্য, ভ্রমণ কাহিনী, কাব্য-উপন্যাস, শিশুতোষ রচনা– নানা কিছু লিখেছেন। গদ্যকার্টুন নামে লেখা তাঁর কলাম খুবই পাঠকপ্রিয়। বই বেরিয়েছে ৭৫টির মতো। তার রচিত টেলিভিশন কাহিনীচিত্রের মধ্যে *নাল পিরান*, *প্রত্যাবর্তন*, *করিমন বেওয়া*, *প্রতি চুনিয়া*, *ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন*, মেগা সিরিয়াল *৫১বর্তী* প্রভৃতি দর্শকনন্দিত হয়েছে। তার রচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র *ব্যাচলর* জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ টিভি নাট্যকার হিসেবে বাচসাস পুরস্কার, টেনাশিনাস পদক, ট্রাব এওয়ার্ড, কালচারাল রিপোর্টার্স এওয়ার্ডসহ পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরস্কার। সাহিত্যের জন্যে পেয়েছেন খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক, কবি মোজাম্মেল হক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার, সুকান্ত পদক, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তাঁর উপন্যাস *মা* পাঠ করে সরদার ফজলুল করিম তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন : আমি বলি দুই মা। ম্যাক্সিম গোর্কির মা আর আনিসুল হকের মা। . . . এখন দুই মা যথার্থ মা হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।